সত্যনিষ্ঠ সাহসী
বালক-বালিকাদের কথা

সূচীপত্র

।। শ্রীহরিঃ ।।

বীর বালক লব-কুশ

মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র মর্যাদা রক্ষার্থে পরমপূত চরিত্রা সীতাদেবীকে বনবাস দিয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতাদেবী প্রকৃতপক্ষে এক এবং অভিন্ন । তাঁদের মিলন এবং বিরহ এই লোকজগতে লীলা মাত্র। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নিজের যশের লোভে বা অপযশের ভয়ে কিংবা কঠোর মনোভাব নিয়ে সীতাদেবীকে ত্যাগ করেননি। তিনি জানতেন সীতা সম্পূর্ণ নির্দোষ। সীতার বিরহে তিনি কম দুঃখ পাননি! সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে তাঁর প্রতি যত না কঠোরতা দেখানো হয়েছে তার থেকেও বেশি কঠোরতা রাম নিজের প্রতি দেখিয়েছেন। সংসারে ধর্ম স্থাপনের জন্যই ঈশ্বরের অবতার গ্রহণ। যদি আদর্শ পুরুষ নিজের জীবনে মর্যাদাহীন আচরণ করেন তাহলে অপর ব্যক্তি সেই উদাহরণ নিয়ে নানা অন্যায় আচরণ করতে সাহস পাবে।

রাবণের লঙ্কাপুরীতে অশোক বনে বিবশ হয়ে সীতাদেবীকে বন্দিনী অবস্থায় কিছুকাল থাকতে হয়েছিল। কিছু কিছু দুষ্ট ব্যক্তি এই নিয়ে নানা কথা বলতে থাকে। যাতে এটির উদাহরণ টেনে নারীরা অনাচারে লিপ্ত না হয় কিংবা পুরুষব্যক্তিও যাতে এই সুযোগে অসৎ কর্মে লিপ্ত না হয়ে পড়ে সেই কথা চিন্তা করেই মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র নিজের প্রতি এই কঠিন আচরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

রাজসিংহাসনের পক্ষেও এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন ছিল যে, প্রজাসাধারণকে সুসংযত রাখতে রাজাকে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে হয় !

শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা পালনে লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে যখন বনে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমের সন্নিকটে রেখে আসেন সেই সময় সীতাদেবী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি সেখান থেকে সস্নেহে সীতাদেবীকে নিজের আশ্রমে নিয়ে আসেন আর সেখানেই তাঁর যমজ সন্তানের জন্ম হয়। মহর্ষি তাদের নাম রাখেন লব আর কুশ। আশ্রমেই মহর্ষি বালকদুটির যথারীতি জাত-সংস্কারাদি করালেন এবং স্বয়ং তাদের নানা শাস্ত্রে তথা যুদ্ধবিদ্যাতেও সুশিক্ষিত করে তুললেন। এছাড়াও মহর্ষি লব-কুশকে স্বরচিত রামায়ণ গানও শেখালেন। সপ্তকাণ্ড আর পাঁচশত সর্গযুক্ত চব্বিশ হাজার শ্লোক সমন্বিত শ্রীরামচরিত যখন দুই ভাই তাদের মৃদু মধুর স্বরে সংগীতশাস্ত্রের তাল-লয়-মান অনুসরণে গাইত তখন যারাই সেই গান শুনত তারাই মুগ্ধ হয়ে যেত।

এই সময়ে অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞ প্রারম্ভে যথাবিধি পূজাদি করে একটি শ্বেত বর্ণের অশ্ব—যার একটি কর্ণ কৃষ্ণবর্ণ, ছেড়ে দেওয়া হল। রাজকুমার পুষ্কল তথা সেনাপতি কালজিৎ-সহ বহু সৈন্যসামন্ত নিয়ে শত্রুঘ্ন অশ্বের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যাত্রা করলেন। মহাবীর হনুমান এবং বানররাজ সুগ্রীব বহু বানর এবং ভল্লুক সৈন্য নিয়ে শত্রুঘ্নকে অনুসরণ করলেন।

অশ্ব আপন গতিতে রাজ্যের পর রাজ্য অতিক্রম করতে লাগল। সৈন্য-বাহিনী তার পিছনে পিছনে সামান্য দূরত্ব রেখে অনুসরণ করতে লাগল, যাতে অশ্বের কোনোরূপ অসুবিধা না হয়। বহু রাজা শত্রুঘ্নকে করদানে স্বীকৃত হল আবার বহু রাজাকে অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে কর আদায়ে বাধ্য করা হল। কোথাও কোথাও যুদ্ধও করতে হল। এইভাবে সর্বত্র বিজয়পতাকা ওড়াতে ওড়াতে যজ্ঞের অশ্ব মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমের সন্নিকটস্থ বনে উপস্থিত হল।

সেই সময় লব-কুশ মুনিকুমারদের সঙ্গে বনের মধ্যে খেলা করছিল। মণিমাণিক্যখচিত স্বর্ণালংকারে সুসজ্জিত সেই অতীব সুন্দর অশ্বকে দেখে সকলে মিলে অশ্বের কাছে ছুটে এল। অশ্বের মাথায় ঝোলানো ছিল সুন্দর ও স্পষ্ট অক্ষরে লেখা এক ঘোষণাপত্র। তাতে লেখা ছিল—'এই অশ্ব অযোধ্যার রাজচক্রবর্তী মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞাশ্ব এবং মহাপরাক্রমশালী শত্রুঘ্ন ইহার রক্ষক। যে যে রাজ্য এই অশ্ব নির্বিঘ্নে অতিক্রম করবে, সেই সেই রাজ্য অযোধ্যার বিজিত রাজ্য বলে গণ্য হবে। যদি কোনো ক্ষত্রিয় রাজার এমতো সাহস হয় যে, অযোধ্যা সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক, তবে তিনি এই অশ্বকে ধরবেন এবং যথারীতি যুদ্ধ করবেন।' এই ঘোষণাপত্র পাঠ করে লব-কুশের ক্রোধের উদ্রেক হল। তারা অশ্বটিকে ধরে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে যুদ্ধের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রথমে অন্যান্য মুনিবালকরা লব-কুশকে বোঝাবার চেষ্টা করল কিন্তু যখন তারা তাদের কথা শুনল না তখন যুদ্ধ দেখার জন্য তারা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অশ্বের সঙ্গে যে সমস্ত রক্ষক সৈন্যসামন্ত ছিল তারা দেখল এক বালক অশ্বটিকে বন্দি করেছে। তারা কাছে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লব উত্তর দিল—'আমি এই অশ্বকে বন্দি করেছি। যে ব্যক্তি একে মুক্ত করবে তার উপর আমার ভাই কুশ নির্ঘাত ক্রুদ্ধ হবে।' রক্ষকেরা ভাবল এই বালক ছেলেমানুষি কথা বলছে, তাই তারা অশ্বটিকে খোলবার জন্য অশ্বের দিকে অগ্রসর হল। লব যখন দেখল লোকগুলি তার কথা শুনছে না তখন সে ধনুকে বাণ লাগিয়ে তাদের সকলের হাতগুলি কেটে ফেলল। তারা সেই অবস্থায় সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে শত্রুঘ্নকে অশ্বের বন্দি বিষয়ে সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত করল।

সৈন্যদের হাত কাটা দেখে এবং তাদের সমস্ত কথা শুনে শত্রুঘ্ন বুঝতে পারলেন অশ্বের বন্ধনকারী বালক দুটি নিতান্ত সাধারণ বালক নয়। সেনাপতিকে তিনি ব্যূহ রচনার আদেশ দিলেন। সমস্ত সেনাবাহিনীকে এক

দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করে দাঁড় করানো হল। আর যেখানে অশ্বটি বাঁধা ছিল সেনাবাহিনীর সঙ্গে তারা সেখানে গিয়ে হাজির হল। ছোট্ট সুকুমার এক বালককে ধনুর্বাণ হাতে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেনাপতি তাকে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করল কিন্তু লবের উত্তর—'তুমি যদি যুদ্ধ করতে ভয় পেয়ে থাক তবে ফিরে যাও, আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। তোমার মালিক রামচন্দ্রকে গিয়ে বল যে লব তার ঘোড়াকে বেঁধে রেখেছে।' অগত্যা যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। লবের বাণবর্ষণে সৈন্যরা পালাতে আরম্ভ করল। হাতি-ঘোড়াসহ অসংখ্য সৈন্য মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। সেনাপতি কালজিৎ মহাবিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগল, কিন্তু লব তার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিমেষে খণ্ড খণ্ড করে দিল, শেষে বাণ দিয়ে প্রথমে তার হাত দুটো এবং পরে মাথা ভূপাতিত করল।

প্রথমে শত্রুঘ্ন সৈন্যদের কাছে এসব খবর বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। তিনি জানতেন যমেরও সাধ্য নাই যে তার দুর্ধর্ষ সেনাপতিকে মারতে পারে। অবশেষে সমস্ত কথা শুনে এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি স্বয়ং সুসজ্জিত সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন। বিরাট বাহিনী লবকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলল। লব যখন দেখল শত্রুসৈন্য তাকে ঘিরে ফেলেছে তখন ধনুর্বাণ নিয়ে সে শত্রু-সৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে লাগল। সৈন্যদের পালাতে দেখে রাজকুমার পুষ্কল এগিয়ে এল। সামান্যক্ষণ যুদ্ধের পরই লবের বাণে পুষ্কল মূর্ছিত হয়ে পড়ল। পুষ্কলের মূর্ছিত হওয়া দেখে স্বয়ং হনুমান ক্রোধভরে লবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এল। হনুমান পাথর, বড় বড় গাছ উপড়ে এনে লবের দিকে ছুড়তে লাগল। কিন্তু লব সব কিছুকে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিতে লাগল। ভীষণ রেগে গিয়ে হনুমান লেজ দিয়ে লবকে জড়িয়ে ধরল। লব তার জননীকে স্মরণ করে হনুমানের লেজে এক ঘুঁসি মারল, আর ঘুঁসির চোটে হনুমান চিৎকার করে লবকে ছেড়ে দিল। তারপর লব এমন সব বাণ দিয়ে হনুমানকে আঘাত করল যে হনুমান মূর্ছিত হয়ে পড়ল। এরপর শত্রুঘ্ন স্বয়ং যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলেন। ভয়ংকর যুদ্ধ

হল। শেষে লব শত্রুঘ্নকেও মূর্ছিত করে ফেলল। শত্রুঘ্নকে জ্ঞান হারাতে দেখে সুরথ আদি রাজন্যবর্গ লবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লব একাই সেই সব মহারথীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর শত্রুঘ্নের মূর্ছা ভাঙল। এবার শত্রুঘ্ন রামের দেওয়া এক বাণ—যা দিয়ে তিনি লবণাসুরকে বধ করেছিলেন, ধনুকে যোজনা করলেন। সেই ভয়ংকর তেজোময় বাণ লবের বুকে লাগার সঙ্গে সঙ্গে লব মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। মূর্ছিত লবকে রথে চাপিয়ে শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় নিয়ে যাবার প্রস্তুতি শুরু করলেন।

যে সব মুনিকুমার দূর থেকে যুদ্ধ দেখছিল তারা দৌড়ে গিয়ে মহর্ষির আশ্রমে সীতাদেবীকে বলল—'মা ! তোমার ছেলে লব কোন্ এক রাজার অশ্বকে বন্দি করেছিল আর সেই রাজার সৈন্যরা লবের সঙ্গে যুদ্ধ করে। লব এখন মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে, তাকে রথে করে ধরে নিয়ে যেতে চাইছে।' ছেলেদের কথা শুনে মা জানকী মনে খুব আঘাত পেলেন, তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সেই সময় কুমার কুশ এসে হাজির হল এবং মাকে তথা মুনিবালকদের জিজ্ঞাসা করে সব কথা জানতে পারল। ভাই-এর মূর্ছার কথা শুনে ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়ে সেও ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে রওনা দিল।

লব সেই সময় রথের উপর শায়িত ছিল কিন্তু তার মূর্ছা ভেঙে গিয়েছিল। দূর থেকে দাদাকে আসতে দেখে সে রথ থেকে লাফিয়ে মাটিতে পড়ল। এবার কুশ পূর্বদিক থেকে আর লব পশ্চিমদিক থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান বিপক্ষ সৈন্যবাহিনীর উপর বাণ বর্ষণ করতে লাগল। ক্রুদ্ধ দুই বালকের বাণের আঘাতে যুদ্ধক্ষেত্র মৃতদেহে ভরে গেল। রথী মহারথীরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল। যে-ই যুদ্ধ করতে আসছিল, তারই দেহ কিছুক্ষণের মধ্যে বাণে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়ছিল। হনুমান আর অঙ্গদকে বাণ মেরে মেরে বার বার তারা আকাশে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। যে মুহূর্তে তাদের দেহ উপর থেকে নিচে পড়তে যাচ্ছিল সেই মুহূর্তে আবার বাণ মেরে তাদের আকাশে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। এইভাবে বলের মতো ওঠা নামা করতে

করতে তারা হয়রান হয়ে পড়ল, অবশেষে যখন দয়া করে দুই ভাই এদের প্রতি বাণ মারা বন্ধ করল তখন তারা মাটিতে পড়ে মূর্ছা গেল। কুশ শত্রুঘ্নকে বাণ মেরে মূর্ছিত করে ফেলল। মহাবীর সুরথ কুশের বাণে মাটিতে পড়ে গেল আর বানররাজ সুগ্রীব কুশের বরুণ বানে বাঁধা পড়ল। কুশ যুদ্ধে বিজয়ী হল।[১]

যুদ্ধ জয়ের পর লব কুশকে বলল—'দাদা ! তোর দয়ায় আজ এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছি। এখন যুদ্ধের চিহ্নস্বরূপ কিছু আশ্চর্য বস্তু সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।' দুই ভাই প্রথমে শত্রুঘ্নের নিকট গেল এবং তাঁর মুকুট থেকে বহুমূল্য মণিটি উপড়ে নিল। তারপর লব পুষ্কলের মুকুটখানি খুলে নিল। দুই ভাই তার বাহু থেকে মূল্যবান গহনাগুলি এবং অস্ত্রশস্ত্রগুলি একে একে খুলে নিল। লব বলল—'দাদা ! আমি এই দুটো বড় বাঁদরকেও নিয়ে যাব। এদের দেখে মা খুব হাসবে আর মুনিবর খুশি হবেন আর আমরাও মজা করব।' এই বলে দুই ভাই এক একজন করে সুগ্রীব এবং হনুমানকে লেজ ধরে টানতে টানতে আশ্রমের দিকে অগ্রসর হল।

পুত্রদের দূর থেকে আসতে দেখে মা জানকী খুব খুশি হলেন। তিনি তাদের নির্বিঘ্নে ফেরার অপেক্ষায় রাস্তার দিকে চেয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। তিনি দেখলেন তাঁর ছেলেরা দুটি বানরকে লেজ ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। তিনি হেসে ফেললেন কিন্তু পরক্ষণেই বানর দুটিকে চিনতে পেরে বলে উঠলেন—'তোরা এদের ধরেছিস কেন ? এদের ছেড়ে দে। এক্ষুনি এদের ছেড়ে দে।' হনুমানকে দেখিয়ে বললেন—'এ লঙ্কা ভস্মকারী মহাবীর হনুমান, আর ও বানররাজ সুগ্রীব। তোরা ওদের হেনস্থা করেছিস কেন ?'

---

[১]শ্রীরামীয় অশ্বমেধপুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, শত্রুঘ্ন মূর্ছিত হওয়ায় সেই সংবাদ অযোধ্যায় পৌঁছায় এবং সৈন্যসামন্তসহ লক্ষ্মণ রণাঙ্গণে উপস্থিত হন। যুদ্ধে লক্ষ্মণ মূর্ছিত হলে অতঃপর ভরত এবং শেষে শ্রীরাম স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। কিন্তু শ্রীরাম যুদ্ধ করেননি কেননা নিজের পুত্রদের উপর শর নিক্ষেপ করা তার উচিত মনে হয়নি। সৈন্যসামন্তকে যুদ্ধভূমিতে প্রেরণ করে তিনি স্বয়ং রথের উপর শায়িতভাবে অবস্থান করতে লাগলেন। এতে লব-কুশ ভেবেছিল যে তিনি বাণের আঘাতে মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন। কল্পভেদ অনুসারে এই ঘটনাও যথার্থ।

লব-কুশ সহজভাবে যুদ্ধের কারণ তথা যুদ্ধের ফলাফল সবই বলে গেল। মা জানকী বললেন— 'বাছারা। তোরা অত্যন্ত অন্যায় করেছিস। ও তো তোদের পিতারই অশ্ব। ওকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দে আর এই বানরদেরও মুক্ত কর।'

মায়ের কথা শুনে লব-কুশ উত্তর দিল—'আমরা তো ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারে অশ্ব বন্দি করেছি আর যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেছি। মহর্ষি আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, ধর্ম অনুসারে যুদ্ধ কোনো অন্যায় কাজ নয়। এখন তোমার আদেশে এই বানর দুটিকে এবং অশ্বটিকে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি।'

সীতাদেবী মনে মনে প্রার্থনা করলেন— 'আমি যদি শ্রীরামচন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষকে চিন্তা না করে থাকি, যদি আমার চিত্ত ধর্মে অবিচল থাকে তবে যুদ্ধে আহত, মূর্ছিত তথা মৃত সমস্ত সৈন্য আবার সুস্থ এবং জীবিত হয়ে উঠুক।'

এদিকে মা জানকীর মুখের কথাগুলি উচ্চারিত হল আর ওদিকে সমস্ত সৈন্য ঘুম থেকে ওঠার ন্যায় উঠে বসল। তাদের কাটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জোড়া লেগে গেল। কারো শরীরে আঘাতের সামান্যতম চিহ্নও রইল না। শত্রুঘ্ন দেখলেন তাঁর মুকুটের মণিটি নেই। যজ্ঞের অশ্ব সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অশ্বকে নিয়ে সকলে অযোধ্যা ফিরে এল এবং সমস্ত ঘটনা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে নিবেদন করল।

অশ্ব ফিরে এলে যজ্ঞ সমাপ্ত হল। দূর দূরান্ত থেকে ক্ষত্রিয় রাজারা তাদের লোকলস্কর নিয়ে হাজির হল। মহর্ষি বাল্মীকিও লব-কুশকে নিয়ে অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে এলেন, এবং সরযূ নদীর তীরে, রাজধানী থেকে কিছু দূরে সকলের সঙ্গে অবস্থান করলেন। মহর্ষির আদেশে লব এবং কুশ মুনিদের আশ্রমে, রাজাদের শিবিরে তথা রাজধানীর রাস্তায় রাস্তায় রামায়ণ গান গেয়ে বেড়াতে লাগল।

লব-কুশের স্পষ্ট উচ্চারণ, সুমধুর কণ্ঠ এবং সুন্দর সুরেলা গান শুনে দলে দলে লোক এসে তাদের পিছনে ভিড় করে দাঁড়াল। সব জায়গাতেই তাদের দুই ভাই-এর গান আলোচনা হতে লাগল। একদিন ভরতের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র প্রাসাদের ছাদ থেকে তাদের গান শোনার পর তাদের ভিতরে ডেকে নিয়ে এসে আদর করে বসালেন এবং রামায়ণ গান মন দিয়ে

শুনলেন। আঠারো হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কারস্বরূপ তাদের দেবার আদেশ দিলেন, কিন্তু লব-কুশ কোনো কিছু নিতে রাজি হল না। লব-কুশের ইচ্ছায় যজ্ঞের অবসর সময়ে রামায়ণ গানের এক আসর করা হল। সেই সময় সকল রাজন্যবর্গ, প্রজাসাধারণ, মুনিঋষিরা সেই গান শুনতে লাগল। কয়েক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ রামায়ণ গান শোনার পর সকলের ধারণা হল এই দুই বালক অবশ্যই মা জানকীর পুত্র।

মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র সকলের সামনে সতীত্ব পরীক্ষার জন্য তাঁকে ডেকে পাঠালেন। জগজ্জননী দেবী জানকী সেখানে এসে প্রতিজ্ঞাপূর্বক বললেন—'যদি আমি সর্বপ্রকারে পবিত্র হই তবে জননী পৃথিবী যেন আমাকে তাঁর কোলে স্থান দেন।' দেখতে দেখতে ভীষণ শব্দে পৃথিবী দুই ভাগ হয়ে ফেটে গেল। স্বয়ং পৃথিবীদেবী রত্ন সিংহাসন নিয়ে উঠে এলেন আর তাতে সীতামাকে বসিয়ে নিয়ে পাতালে অদৃশ্য হলেন। দুই খণ্ড পৃথিবী আবার জোড়া লেগে এক হয়ে গেল। এরপর আর কী বলার থাকে ?

লব-কুশ জন্মকালে পিতার মুখ দেখেনি, আর যখন পিতাকে পেল তখন পরম স্নেহময়ী জননী তাদের ছেড়ে গেলো ।

অযোধ্যার যুবরাজ হওয়ার সুখ কি তাদের যথার্থভাবে সুখী করতে পেরেছিল ?

—— ○ ——

বীর কুবলয়াশ্ব

মহাপরাক্রমশালী রাজা শত্রুজিতের কাছে একদিন মহর্ষি গালব এসেছিলেন। মহর্ষি সঙ্গে করে এনেছিলেন এক দিব্য অশ্ব। মহারাজ শত্রুজিত মহর্ষি গালবকে যথারীতি পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। মহর্ষি জানালেন—'আশ্রমে এক দুষ্ট রাক্ষস বাঘ, সিংহ, হাতি ইত্যাদি নানা বন্যপশুর রূপ ধরে এসে বারবার আশ্রম লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। যদিও তাকে

ক্রোধে ভস্ম করে দেওয়া যায়, কিন্তু তা করলে তপস্যার ফল নষ্ট হবে। আমরা কষ্ট করে যে তপস্যা করি তার ফল এভাবে নষ্ট হতে দিতে চাই না। আমাদের দুর্দশা দেখে সূর্যদেব এই কুবলয় নামক অশ্বটিকে পাঠিয়েছেন। এই অশ্ব না থেমে সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারে আর এর গতি জলে স্থলে এবং অন্তরীক্ষেও সমানভাবে অব্যহিত। দেবতারা এ কথাও বলে পাঠিয়েছেন যে, এই ঘোড়ায় চড়ে আপনার পুত্র শ্রীমান ঋতধ্বজ ওই অসুরকে বধ করতে সক্ষম। অতএব আপনি রাজকুমারকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন। এই অশ্বকে লাভ করে রাজকুমার 'কুবলয়াশ্ব' নামে পৃথিবীতে খ্যাত হবেন।

ধর্মাত্মা রাজা ঋষির আজ্ঞা মেনে নিয়ে রাজকুমারকে মহর্ষির সঙ্গে যাবার অনুমতি দিলেন। রাজকুমার মহর্ষির সঙ্গে আশ্রমে গেলেন এবং সেখানে বাস করতে লাগলেন। একদিন মুনিগণ যখন সন্ধ্যাপাসনা করতে ব্যস্ত, সেই সময় শূকরের বেশ ধরে সেই শয়তান রাক্ষস মুনিগণকে বিব্রত করতে সেখানে এসে হাজির হল। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমবাসী মুনি ও শিষ্যগণ চিৎকার চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিল। রাজকুমার ঋতধ্বজ সত্বর ঘোড়ায় চড়ে ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে রাক্ষসকে অনুসরণ করলেন। ধনুকে অর্ধ-চন্দ্রাকার বাণ সংযোজন করে তাকে বিদ্ধ করলেন। অসুর বাণবিদ্ধ হয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য দ্রুত পলায়ন করতে লাগল। রাজকুমারও তার পিছনে পিছনে ছুটতে লাগলেন। পাহাড়, পর্বত, বন-জঙ্গল যেখানেই সে লুকোবার চেষ্টা করছিল সেখানেই রাজকুমার ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে বিব্রত করছিলেন। শেষে দ্রুত দৌড়ে গিয়ে রাক্ষসরূপী শূকরটি এক গহ্বরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। রাজকুমারও ঘোড়াকে সেই গহ্বরে লাফিয়ে পড়ার জন্যে কশাঘাত করলেন। গহ্বরটি ছিল পাতালে যাবার একটি সুড়ঙ্গপথ। সেই অন্ধকার রাস্তা ধরে রাজকুমার পাতালে গিয়ে পৌঁছলেন। স্বর্গতুল্য পাতালে পৌঁছে ঘোড়াটিকে এক জায়গায় বেঁধে রেখে তিনি এক সুরম্য প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। সেখানে রাজকুমারের সঙ্গে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসার সাক্ষাৎ হল। দানবরাজ ব্রজকেতুর দুষ্ট পুত্র পাতালকেতু তাঁকে স্বর্গ থেকে হরণ করে

এখানে এনে রেখেছিল। রাক্ষস মদালসাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। কিন্তু মদালসা যখন জানতে পারলেন যে, রাক্ষস পাতালকেতু রাজকুমারের বাণে বিদ্ধ হয়েছে তখন তিনি রাজকুমার ঋতধ্বজকে পতিত্বে বরণ করলেন।

রাজকুমার ঋতধ্বজ মদালসাকে বিবাহ করেছে শুনে পাতালকেতু তার দলবল নিয়ে সেখানে এসে হাজির হল। অসুরসৈন্য রাজকুমারের উপরে অস্ত্র বর্ষণ আরম্ভ করল কিন্তু রাজকুমার অনায়াসে সে সব অস্ত্র বাণ দিয়ে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেললেন। ত্বাষ্ট্র নামক দিব্যাস্ত্রের সাহায্যে দানবসৈন্যদের মুহূর্তের মধ্যে যমালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। মহর্ষি কপিলের অভিশাপে যেমন সগরের ষাট হাজার পুত্র ভস্ম হয়েছিল তেমনি কুমারের দিবাস্ত্রে দানবেরা মুহূর্তের মধ্যে ভস্মে পরিণত হল।

নববধূকে সঙ্গে নিয়ে রাজকুমার ঋতধ্বজ সেই ঘোড়ায় আরোহণ করে পাতাল থেকে নিজ রাজধানীতে ফিরে এলেন। বিজয়ী পুত্রকে পেয়ে রাজা শত্রুজিৎ খুব খুশি হলেন। তারপর সময় হলে কুমার ঋতধ্বজ কুবলয়াশ্ব নাম নিয়ে সিংহাসনে বসলেন। তার মহিষী মদালসা পরম তত্ত্বজ্ঞানী মহিলা

ছিলেন। তিনি তাঁর সন্তানদের অল্পবয়সেই পালঙ্কে দোলনা দেওয়ার সময় তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ শোনাতেন। ফলে তাঁরা সকলেই পরবর্তীকালে ঈশ্বরের অনুভূতি লাভ করেছিলেন।

---o---

বীর অসুরবালক বর্বরীক

মহাবীর পাণ্ডুর মধ্যম পুত্র ভীমসেন হিড়িম্বা নামক এক রাক্ষসীকে বিবাহ করেন। হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ নামে এক মহাপরাক্রমশালী পুত্র জন্মায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ঘটোৎকচ ভৌমাসুরের প্রধান নগররক্ষী মুরের পরমাসুন্দরী কন্যা কামকণ্টকাকে বিবাহ করে। ঘটোৎকচের ঔরসে মুর কন্যার গর্ভে এক পুত্রের জন্ম হয়, নাম তার বর্বরীক। রাক্ষসীরা গর্ভ ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সন্তান প্রসব করে আর তাদের সন্তান জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে যৌবন প্রাপ্ত হয় ও ক্ষমতার অধিকারী হয়। বালক বর্বরীক জন্ম থেকেই খুব বিনয়ী, ধর্মপরায়ণ আর মহান ছিল। একদিন তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘটোৎকচ দ্বারকায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করে প্রণাম নিবেদন করেন। হাত জোড় করে বর্বরীক ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে—'হে আদিদেব মাধব ! আমি মন বুদ্ধি চিত্তের একাগ্রতা দিয়ে আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছি। হে পুরুষোত্তম ! সংসারে জীবের কল্যাণ কিসে হয় ? কেউ ধর্মকে, কেউ দানধ্যানকে, কেউ তপস্যাকে, কেউ সম্পদকে আবার কেউ ভোগকে তথা কেউ আবার মোক্ষকে কল্যাণ বলে মনে করে। এই হাজার রকম শ্রেয়ের মধ্যে একটি শ্রেয় নিশ্চিত করে বলুন যা আমার বংশের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর।'

ভগবান বললেন—'বৎস ! যে, যে কুলে এবং বর্ণে জন্মেছে তার কল্যাণের সাধনা তার সেই বর্ণ এবং কুলের অনুরূপই হয়। তপস্যা, ইন্দ্রিয়-সংযম তথা বেদ পাঠাদি ব্রাহ্মণের পক্ষে কল্যাণকারী, ক্ষত্রিয়ের প্রধান কাজ

শক্তি অর্জন কেননা শক্তি দ্বারা দুষ্টের দমন এবং সাধুদের রক্ষা করার মধ্যেই তাদের কল্যাণ নিহিত। বৈশ্য পশুপালন, ব্যবসাবাণিজ্য দ্বারা উপার্জিত ধন দান ধ্যান করে নিজ কল্যাণ সাধন করে। শূদ্র ওই তিন বর্ণের সেবা দ্বারা সমাজকে সাহায্য করে কুল-কল্যাণ সাধন করে। তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম নিয়েছ, অতএব তুমি প্রথমে অশেষ ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করো। ভগবতীর কৃপায় শক্তি লাভ হয়। সুতরাং তোমার উচিত শক্তিরূপা দেবীর আরাধনা করা।

পুনরায় বর্বরীকের জিজ্ঞাসার উত্তরে ভগবান তাকে মহীসাগরসঙ্গম তীর্থে গিয়ে দেবর্ষি নারদের দ্বারা আনিত নবদুর্গার আরাধনা করতে উপদেশ দিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ লাভ করে বর্বরীক কঠোর সাধনায় রত হলেন। তিন বৎসর পর বর্বরীকের সাধনায় দেবী তুষ্ট হয়ে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়ে ত্রিভুবনে যে শক্তি কারো নেই এমন দুর্লভ শক্তি লাভের বরদান করলেন। বরদান করে দেবী বললেন—'বৎস ! তুমি কিছুদিন এখানেই অবস্থান করো। 'বিজয়' নামক এক ব্রাহ্মণ এখানে আসবে, তার সঙ্গ লাভে তোমার আরও অনেক উপকার হবে।'

দেবীর আজ্ঞা মতো বর্বরীক সেখানেই অবস্থান করতে লাগল। কিছুদিন পর মগধ দেশ থেকে বিজয় নামে এক ব্রাহ্মণ সেখানে এলেন। তিনি কুমারেশ্বর আদি সাতটি শিবলিঙ্গের উপাসক এবং বিদ্যালাভের জন্য বহুদিন যাবৎ দেবীর তপস্যা করেছেন। দেবী স্বপ্নে তাঁকে আদেশ দেন—'তুমি সিদ্ধমাতার মন্দিরের সামনের প্রাঙ্গণে বসে সর্ববিদ্যার সাধনা করো। আমার ভক্ত বর্বরীক তোমাকে সাহায্য করবে।' বিজয় মহীসাগরসঙ্গমে ভীমের পৌত্র বর্বরীকের সাক্ষাৎ লাভ করলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে বললেন—'যতদিন আমি বিদ্যার আরাধনা করব ততদিন তুমি নিদ্রাহীন এবং পবিত্র চিত্তে দেবীর স্তোত্র পাঠ করতে করতে এখানে অবস্থান করো, যাতে আমার সাধনায় কোনোরূপ বিঘ্ন না ঘটে।'

বিজয় আপন সাধনায় রত হলেন আর বর্বরীক সতর্কভাবে তাঁকে রক্ষা করতে লাগল। বিজয়ের সাধনায় বিঘ্নসৃষ্টিকারী রেপলেন্দ্র নামক দুরন্ত অসুর

আর দ্রুহদ্রুহা নামক রাক্ষসীকে বর্বরীক সংহার করল। তারপর পাতালে গিয়ে নাগজাতিকে আক্রমণকারী পলাসী নামক দুষ্ট অসুরদের নিহত করল।

সেই সব অসুর মারা যাবার পর নাগরাজ বাসুকী তার কাছে এলেন। তিনি বর্বরীকের ভূয়সী প্রশংসা করলেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর দিতে চাইলেন। বর্বরীক বর চাইল যে, বিজয় যেন নির্বিঘ্নে তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেন।

পাতালপুরী থেকে ফিরে আসার সময় নাগকন্যারা বর্বরীকের রূপ এবং বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে সকলেই তাকে বিবাহ করতে চাইল। কিন্তু জিতেন্দ্রিয় বর্বরীক কোনোভাবেই রাজি হল না। সে ছিল আজীবন ব্রহ্মচারী। বর্বরীক পাতালপুরী থেকে ফিরে এলে বিজয় সেদিন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সিদ্ধকাম বিজয় বললেন—'বীরেন্দ্র ! আমি তোমার দয়ায় সিদ্ধিলাভ করেছি। আমার যজ্ঞকুণ্ডে লাল রঙের পরম পবিত্র ভস্ম আছে, তুমি তা দুই হাত ভরে নিয়ে যাও। যুদ্ধক্ষেত্রে এই ভস্ম ছড়িয়ে দিলে মৃত্যুও যদি শত্রু হয়ে আসে তবে তারও মৃত্যু অনিবার্য। তুমি সহজেই শত্রুকে জয় করতে পারবে।' বর্বরীক উত্তর দিল— 'তিনিই উত্তম পুরুষ যিনি কোনো কিছুর প্রত্যাশা না করে পরের উপকার করেন। নইলে তার উপকারের কী দাম ? এ-ভস্ম আপনি অন্য কাউকে দিন। আমি তো আপনার কৃতকার্যতা এবং আনন্দ দেখেই খুশি।'

বিজয়কে দেবতারা সিদ্ধৈশ্বর্য প্রদান করেছিলেন এবং সেদিন থেকে তাঁর নাম হয়েছিল 'সিদ্ধসেন'। বিজয় সেখান থেকে চলে যাবার বেশ কিছুদিন পর পঞ্চপাণ্ডব পাশা খেলায় পরাজিত হয়ে অরণ্য এবং বহু তীর্থ ঘুরতে ঘুরতে একদিন সেখানে এসে হাজির হল। পাণ্ডবদের পাঁচ ভাই এবং দ্রৌপদী সকলেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। মা চণ্ডীদেবীকে দর্শন করে তাঁরা সেখানে বসে পড়লেন। বর্বরীক সেখানেই অবস্থান করছিল। কিন্তু বর্বরীক পাণ্ডবদের কিংবা পাণ্ডবগণ বর্বরীরকে কোনোদিন দেখেনি। সুতরাং তারা পরস্পরকে চিনতে পারল না। পিপাসায় কাতর ভীমসেন জলপানের জন্য সিদ্ধেশ্বরীর কুণ্ডে নামতে গেলে যুধিষ্ঠির তাঁকে বলে দিলেন— 'প্রথমে কুণ্ড থেকে জল নিয়ে দূরে হাত-পা ধোবে তারপর জল পান করবে।' কিন্তু ভীম পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরের কথা না শুনে তিনি জলে নেমে পড়লেন এবং হাত-পা ধুতে লাগলেন। তাঁকে এইরূপ করতে দেখে বর্বরীক ধমকে উঠল, বলল— 'তুমি দেবীর কুণ্ডে হাত-পা ধুয়ে জলকে অপবিত্র করছ, আমি এই জল নিয়ে প্রত্যহ দেবীকে স্নান করাই। যখন, তোমার বিচারবুদ্ধি এতই সামান্য তখন বৃথা তীর্থে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছ ?

ভীমসেনও গর্জন করে বর্বরীককে ধমকে উঠলেন। বললেন— 'জল

স্নান করার জন্যই আর তীর্থে স্নান করার বিধি আছে।' এই সব কথা বলে ভীমসেন নিজের কর্মের সমর্থন করলেন। বর্বরীক উত্তর দিল—'যার জল সর্বদা প্রবাহমান সেই তীর্থের জলে নেমে স্নান করার বিধি আছে। কূপ, পুষ্করিণী ইত্যাদি থেকে জল তুলে নিয়ে দূরে গিয়ে স্নান করা উচিত—এই রূপই শাস্ত্রের বিধান। ভক্তগণ যেখান থেকে দেবতাকে স্নান করাবার জন্যে জল নেয় না আর যে সরোবর মন্দির থেকে একশত হাতের বেশি দূরে অবস্থিত, সেখানে প্রথমে দুই পা ধুয়ে তবে জলে স্নান করা যায়। যে ব্যক্তি জলে মল, মূত্র, বিষ্ঠা, কফ্, থুতু ইত্যাদি ফেলে এবং কুলকুচি করে সে ব্রহ্মহত্যাকারী বলে বিবেচিত হয়।

যার হাত, পা, মন ইন্দ্রিয়াদি আপন বশে থাকে, যিনি সংযমী, তিনি তীর্থের ফল লাভ করেন। মানুষ পুণ্য কর্মের দ্বারা যদি এক ঘণ্টারও কম সময় বেঁচে থাকে তবে সেই শ্রেষ্ঠ। লোক-বিরুদ্ধ পাপ কর্ম করে কল্পকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশ্বাস পেলেও তা গ্রহণ করা অনুচিত। অতএব তুমি তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে এসো।'

বর্বরীকের শাস্ত্রসম্মত কথা ভীমসেন যখন শুনলেন না তখন বর্বরীক পাথরের টুকরো নিয়ে ভীমসেনের মাথা লক্ষ্য করে ছুড়তে লাগল। আঘাত বাঁচিয়ে ভীমসেন জল থেকে উঠে এলেন এবং বর্বরীককে আক্রমণ করলেন। দুইজনই মহাবলবান, অতএব দুজনের মধ্যে ভয়ানক মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হল। ঘণ্টা দুই যুদ্ধের পর ভীমসেন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বর্বরীক তাঁকে মাথার উপর তুলে দুই হাত দিয়ে তুলে সমুদ্রে ফেলে দেবার জন্য অগ্রসর হল। সমুদ্রের ধারে পৌঁছতেই আকাশ থেকে ভগবান শংকর বললেন—'রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! একে ছেড়ে দাও। এযে তোমার পিতামহ, পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন। একে তোমার সম্মান জানানো উচিত।'

বর্বরীক এই বাণী শোনামাত্র ভীমসেনকে মাথার উপর থেকে নামিয়ে তাঁর চরণে পতিত হল। নিজেকে সে ধিক্কার দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভীমসেনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল। এইরূপ বিব্রত দেখে ভীমসেন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বোঝাতে লাগলেন— 'বৎস্য তোমার কোনো অপরাধ নেই। ভুল আমিই করেছি। যে কেউ কুপথে চালিত হোক, ক্ষত্রিয়ের উচিত

তাকে দণ্ড দেওয়া। আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার পূর্বপুরুষগণ ধন্যবাদের যোগ্য ; কেননা তোমার মতো ধর্মাত্মা পুত্র তাঁদের বংশে উৎপন্ন হয়েছে। তুমি ধার্মিক পুরুষগণেরও প্রশংসার যোগ্য। তুমি দুঃখ করো না।'

এতেও বর্বরীকের দুঃখ মিটল না। সে বলল বলল—'পিতামহ ! আমি প্রশংসার যোগ্য নই, সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কিন্তু যে মাতাপিতার অসম্মান করে তার উদ্ধার নেই। যে শরীর দিয়ে আমি আমার পিতামহের প্রতি অপরাধ করেছি সেই শরীর আজ এই মহীসাগরসঙ্গমে বিসর্জন দেব, যাতে পরজন্মে এমন অপরাধ না করি।'

বর্বরীক সমুদ্রের ধারে পৌঁছে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হল এমন সময় সেখানে সিদ্ধমাতা তথা দিক্‌দেবীগণ ভগবান রুদ্রের সঙ্গে এসে হাজির হলেন। তাঁরা বর্বরীককে উপদেশ দানে শান্ত করে আত্মহত্যা থেকে বিরত করলেন। আত্মহত্যা থেকে বিরত হয়ে বর্বরীক উদাস মনে ফিরে গেল। বর্বরীকের প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় পেয়ে পাণ্ডবেরা ভীষণ আশ্চর্য এবং আনন্দিত হলেন এবং বর্বরীককে সম্মানিত করলেন।

যখন পাণ্ডবদের বনবাসপর্ব শেষ হল আর দুরাত্মা দুর্যোধন তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করল তখন কুরুক্ষেত্রে মহাভারত যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ হল। যুদ্ধের প্রারম্ভে মহারাজ যুধিষ্ঠির অর্জুনকে নিজ পক্ষের মহারথীগণের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে অর্জুন সকল বীরগণের পরিচয় দিয়ে শেষে বললেন—'আমি একাই কৌরব সৈন্যদের একদিনে ধ্বংস করে দিতে পারি।' একথা শুনে বর্বরীক থাকতে না পেরে বলল আমার কাছে এমন সব দিব্য অস্ত্রশস্ত্র এবং বস্তু আছে যা দিয়ে আমি এক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কৌরব বাহিনীকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিতে পারি।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্বরীকের কথা সমর্থন করে বললেন— 'বৎস ! তুমি ভীষ্ম দ্রোণ আদি দ্বারা রক্ষিত কৌরব বাহিনীকে একদিনে কীভাবে নাশ করতে পারো ?'

ভগবানের কথা শুনে অসীম বলশালী বর্বরীক নিজের ভয়ংকর ধনুকটি ধরে তাতে একটি নল সংযোজন করে সেই ফাঁপা নলটি লাল রং দিয়ে ভরে আকর্ণ বাণটিকে টেনে ছেড়ে দিল। আর সেই বাণ থেকে নিক্ষিপ্ত লাল ভস্ম

ধরাশায়ী করতে করতে সে এগিয়ে চলল। এইভাবে ছটি দ্বার সে অনায়াসে পেরিয়ে গেল।

অভিমন্যু একলা, আর তাকে সর্বদাই যুদ্ধ করতে হচ্ছিল। যে মহারথীকে সে হারিয়ে পিছনে ফেলে আসছিল সেই পরক্ষণে তার পিছু নিচ্ছিল। এবার সপ্তম দ্বারের মূল কোথায় এ খবর সে জানত না। তাতেও কিন্তু তাকে ক্লান্ত কিংবা শ্লথগতি দেখাচ্ছিল না। অপরদিকে কৌরব পক্ষের বড় বড় সব মহারথী অভিমন্যুর বাণে আহত হয়ে পড়েছিল। দ্রোণাচার্য স্পষ্ট বললেন—'এই বালকের হাতে যতক্ষণ ধনুর্বাণ থাকবে ততক্ষণ একে পরাজিত করা সম্ভব হবে না।'

কর্ণ আদি ছয় মহারথী এক সঙ্গে অন্যায়ভাবে অভিমন্যুকে আক্রমণ করল। তারা এক এক জন করে রথের এক একটি ঘোড়াকে হত্যা করতে লাগল। একজন সারথীকে নিহত করল, কর্ণ তার ধনুকখানি কেটে ফেলল। এরপরও অভিমন্যু রথ থেকে লাফিয়ে নেমে শত্রু সৈন্যকে গদা দ্বারা আঘাত করতে লাগল। তার গদার আঘাতে পুনরায় চারিদিকে ছোটাছুটি আরম্ভ হল। ক্রূর শত্রুর দল অন্যায়ভাবে তাকে ঘিরে ধরল। সকলেই তার উপর অস্ত্র বর্ষণ করছিল। তার কবচ এবং মুকুট কেটে মাটিতে পড়ে গেল। বাণে বাণে তার শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল, আর রক্তের ধারা বইছিল সর্বাঙ্গে। যখন অভিমন্যুর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র শেষ হয়ে গেল তখন সে অন্য উপায় না দেখে রথের চাকা খুলে নিয়ে শত্রুকুলকে বিনাশ করতে লাগল। এ সময় তার সম্মুখীন হতে কেউ সাহস করল না, তারা পিছন থেকে তার শিরস্ত্রাণ বিহীন মাথায় গদার আঘাত করল। আর সেই গদার আঘাতেই অভিমন্যু চিরদিনের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে ধরাশায়ী হল। এইভাবে বীরের মতো অভিমন্যু বীরগতি প্রাপ্ত হল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগ্নী সুভদ্রাকে সান্ত্বনা দেবার সময় বলেছিলেন অভিমন্যুর মতো এইরকম মৃত্যু প্রত্যেক বীরের কাম্য হওয়া উচিত।

———o———

বীর বালক অভিমন্যু

সে সময় মহাভারতের যুদ্ধ চলছিল। ভীষ্ম পিতামহ শরশয্যায় শুয়ে আছেন, আর দ্রোণাচার্য কৌরবদের সেনাপতি হয়েছেন। দুর্যোধন বারবার আচার্যকে বলছেন—'আপনি পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন। আপনি যদি তা না করতেন তবে আপনার পক্ষে পাণ্ডবদের জয় করা কখনো কঠিন নয়।' আচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন—'অর্জুন জীবিত থাকতে পাণ্ডবদের জয় করা দেবতাদেরও অসাধ্য। তুমি যদি অর্জুনকে দূরে নিয়ে যেতে পারো তবে আমি বাকি সবাইকে পরাজিত করব। দুর্যোধনের প্ররোচনায় সংশপ্তক বাহিনীর বীর যোদ্ধাগণ অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করল আর আসল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাঁকে অনেক দূরে যুদ্ধ করতে করতে সরিয়ে নিয়ে গেল।

এদিকে দ্রোণাচার্য নিজের ব্যূহমধ্যে অন্য আর এক চক্রব্যূহ রচনা করলেন। যুধিষ্ঠির যখন একথা শুনলেন তখন তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পাণ্ডব পক্ষের একমাত্র অর্জুনই চক্রব্যূহ ভেদ করতে জানতেন। অর্জুন না থাকায় তিনি পরাজয় নিশ্চিত ভেবে নিলেন। আপন পক্ষীয় সেনাদের হতাশ হতে দেখে অর্জুনের পনেরো বৎসরের পুত্র সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু বলল—'মহারাজ ! আপনি চিন্তা করছেন কেন ? আমি কাল একলাই চক্রব্যূহে প্রবেশ করে শত্রুর গর্ব চূর্ণ করব।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'বৎস্য ! তুমি চক্রব্যূহের রহস্য কি করে জানলে ?' অভিমন্যু উত্তর দিল—'মহারাজ ! আমি যখন মায়ের গর্ভে ছিলাম তখন একদিন রাত্রে বাবা মাকে চক্রব্যূহের বৃত্তান্ত বলছিলেন। বাবা চক্রব্যূহের ছয়টি দ্বারের প্রবেশ-রহস্য বলেছিলেন আর সেই সময় মায়ের নিদ্রা এসে যায়। পরের কথা আর বাবা বলেননি। অতএব আমি চক্রব্যূহে প্রবেশ করে ছটি দরজা পেরিয়ে যেতে পারব কিন্তু সপ্তম দ্বার ভেদ করে

বেরিয়ে আসবার বিদ্যা আমার জানা নাই।'

উৎসাহিত হয়ে ভীমসেন বললেন—'সপ্তম দ্বার তো আমি আমার গদা দিয়ে চুরমার করে দেব।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যদিও চাইছিলেন না যে বালক অভিমন্যু ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করুক কিন্তু দ্বিতীয় আর কোনো উপায় ছিল না। অভিমন্যু অতিরথী যোদ্ধা হিসাবে প্রতিদিন যুদ্ধে যোগদান করত। তার নিজেরও আগ্রহ ছিল এই ভীষণ যুদ্ধে নিজে প্রবেশ করতে। পরের দিন যুদ্ধ আরম্ভ হল। দ্রোণাচার্য চক্রব্যূহের প্রধান প্রবেশ পথ রক্ষার দায়িত্ব দুর্যোধনের ভগ্নিপতি জয়দ্রথের উপর দিলেন। জয়দ্রথ কঠোর তপস্যা দ্বারা ভগবান শংকরের কাছে বর পেয়েছিলেন অর্জুন ছাড়া বাকি পাণ্ডবদের সকলকে সে জয় করতে সক্ষম হবে। অভিমন্যু বাণ বর্ষণ করতে করতে জয়দ্রথকে অস্থির করে ব্যূহের ভিতর প্রবেশ করল কিন্তু জয়দ্রথ ক্ষণিকের মধ্যে সতর্ক হয়ে প্রবেশ দ্বার আবার বন্ধ করে দিল। সারা দিন সর্বশক্তি দিয়েও ভীমসেন কিংবা অপর কেউ আর ব্যূহে প্রবেশ করতে পারল না। জয়দ্রথ একাই ভগবান শংকরের বরের প্রভাবে দ্বার রক্ষা করতে সমর্থ হল।

পনেরো বৎসরের বালক অভিমন্যু আপন রথে বসে শত্রুব্যূহে প্রবেশ করল। চারিদিক থেকে তার উপর অস্ত্র বর্ষণ হতে লাগল কিন্তু তাতে সে এতটুকু ভীত হল না। সে আপন ধনুক দ্বারা বৃষ্টি ধারার মতো চারিদিকে বাণ বর্ষণ করতে লাগল। কৌরবদের হাতি, ঘোড়া সৈন্য সব মুণ্ডহীন হয়ে মাটিতে পড়তে লাগল। রথসকল চূর্ণবিচূর্ণ হতে লাগল। চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেল। যে যেদিকে পারল ছুটে পালাতে আরম্ভ করল। দ্রোণাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য আদি বড় বড় মহারথীরা এগিয়ে এল কিন্তু অভিমন্যুর গতি রোধ করতে পারল না। সে দিব্যাস্ত্র দিয়ে শত্রুপক্ষের দিব্যাস্ত্র সব কাটতে লাগল। তার বাণের আঘাতে দ্রোণ এবং কর্ণকেও বারবার পিছু হটতে হচ্ছিল। একের পর এক ব্যূহদ্বার ভাঙতে ভাঙতে দ্বাররক্ষী মহারথীদের

বীর বালক ভরত

জ্ঞানী, যোগী, ত্যাগী ভরত ঋষভ তনয়।
দুষ্মন্তের পুত্র ভরত বীরত্বে দুর্জয়॥

দুই ভরতের নামে ভারত মণ্ডল।
পৌরুষ, মহত্ব, ত্যাগে চির সমুজ্জ্বল॥

রাজর্ষি ঋষভ পুত্রের গ্রন্থ ভরা গাথা।
শকুন্তলা-তনয় বীর ভরতের বীরত্বের কথা॥

মুনির আশ্রমে জন্ম, জননী লালিত।
শৈশবে সাহস দেখে সবাই চকিত॥

হামাগুড়ি দেয় যবে বসন খুলে পড়ে।
বাঘ সিংহের কোলে শুয়ে মুখে হাত ভরে॥

টলমল চলে শিশু বগলেতে সিংহের ছানা।
বাঘ-সিংহের গর্জনেও নাহি কোনো মানা॥

বড় বড় সিংহগুলোর কান ধরে টানে।
মুখের মধ্যে হাত দিয়ে দাঁতগুলো গণে॥

চার বছরের ভরত বাঘের পিঠে চড়ে।
হাসে আর তালি দেয় নাহি যায় পড়ে॥

লাঠি হাতে ধমক দেয় বাঘ ভালুক যত।
বলে আয় কুস্তি লড়ি দেখি জোর কত॥

ল্যাজ নেড়ে বাঘ সিংহ জানায় ভালোবাসা।
ভালুক আর হাতি আনে মিষ্ট ফল খাসা॥

এমন বীর পুত্র পেয়ে মাতা আনন্দিত।
ভাবেন ভরত রাজা হবে সে কথা নিশ্চিত॥
বড় হয়ে রাজা হন ধর্মাত্মা ভরত মহান।
বীরগণ আজো তার গায় গুণগান॥

বীর বালক স্কন্দগুপ্ত

পঞ্চম শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ার মরু অঞ্চলে শক, হুন প্রভৃতি দুর্ধর্ষ জাতির বসবাস ছিল। শক এবং হুনেরা ছিল অত্যন্ত যুদ্ধবাজ এবং নিষ্ঠুর। তারা বহুবার ইউরোপ আক্রমণ করেছে আর সেখানে লুটতরাজ করে উজাড় করে দিয়েছে। সমৃদ্ধশালী বিশাল রোম সাম্রাজ্য তাদের আক্রমণে কতবার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে! তারা চীনদেশকেও রেহাই দেয়নি, সেখানেও লুটতরাজ চালিয়েছে। এই জাতির লোকেরা যখন তাদের বিরাট বাহিনী নিয়ে কোনো দেশ আক্রমণ করত তখন সে দেশে হাহাকার পড়ে যেত।

একবার খবর পাওয়া গেল হিমালয়ের ওপারে হুনেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করার জন্য বিরাট সৈন্যদল নিয়ে জমায়েত হয়েছে। সেই সময় ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় রাজ্য ছিল মগধ। কুমারগুপ্ত তখন মগধের সম্রাট পদে আসীন। তাঁর পুত্র যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত তখনও নাবালক। হুনদের একত্রিত হবার সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত তার পিতার কাছে ছুটে গেল। কুমারগুপ্ত সেই সময় হুন সৈন্যদের মোকাবিলার জন্যে মন্ত্রী অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন। স্কন্দগুপ্ত বলল— 'পিতা! আমি যুদ্ধ করতে যাব।'

মহারাজ কুমারগুপ্ত তাকে অনেক করে বোঝালেন। বললেন—হুনেরা ভয়ংকর যোদ্ধা আর তেমনি নিষ্ঠুর। তারা লুকিয়ে থেকে অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করে আর তাছাড়া ওদের সৈন্যসংখ্যাও বিস্তর। ওদের সঙ্গে যুদ্ধ মানে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করা।

কিন্তু যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত ওসব কথায় ভয় তো পেলই না বরং বলল—'পিতা! দেশ এবং ধর্মের রক্ষার জন্যে যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া তো ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গৌরবের। আমি মৃত্যুর সঙ্গেই লড়াই করব এবং দেশকে নিষ্ঠুর শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করব।'

মহারাজ কুমারগুপ্ত বীর পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। স্কন্দগুপ্ত যুদ্ধে

যাবার অনুমতি লাভ করল। তার সঙ্গে মগধের দু-লক্ষ সৈন্য যুদ্ধযাত্রা করল। পাটলিপুত্র থেকে বেরিয়ে পাঞ্জাবের ভিতর হয়ে হিমালয়ের বরফ ঢাকা এক সাদা পাহাড়ের নিচে বিশাল প্রান্তরে বীর সৈনিকের দল এসে পৌঁছল। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা, হিমেল হাওয়া আর তুষার ঝড় তাদের এগিয়ে যেতে বাধা দিতে পারল না।

এর আগে হূনরা সর্বদাই অন্যদের আক্রমণ করেছে, কিন্তু কেউ যে আগে এসে তাদের আক্রমণ করতে পারে এ তারা কোনোদিন কল্পনাও করেনি। যখন তারা দেখল হিমালয়ের পাহাড় ডিঙিয়ে বিরাট সৈন্যদল তাদের আক্রমণ করতে আসছে তখন তারাও যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হল। তাদের সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য লেগেছিল যে পর্বতের উপর থেকে নেমে আসা সৈন্যদলের আগে আগে একটি ছোট্ট বালক ঘোড়ায় চড়ে খোলা তলোয়ার হাতে শাঁখ বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে। ওই বালকই হল যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত।

যুদ্ধ আরম্ভ হল। যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত যেদিকেই ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে সেই দিকেই শত্রুসৈন্য দলে দলে তলোয়ারের আঘাতে ধরাশায়ী হচ্ছে। কিছুক্ষণ

যুদ্ধের পর হুনদের মনোবল ভেঙে পড়ল। তারা ইতস্তত ছুটে পালাতে লাগল। শেষে সমস্ত হুন বাহিনীই পালিয়ে গেল। শত্রুর উপর বিজয় লাভ করে স্কন্দগুপ্ত যখন হিমালয় পেরিয়ে আবার দেশে ফিরল তখন তাকে স্বাগত জানাতে রাজধানীতে আগে থেকেই লক্ষ লক্ষ লোক জমায়েত হয়েছিল। মগধে তো রাজধানী থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরের রাস্তা পর্যন্ত নানান সাজে সাজানো হয়েছিল। সেদিন তাকে স্বাগত জানাতে সারা দেশে উৎসব পালন করা হয়েছিল।

এই যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত পরবর্তীকালে ভারতের সম্রাট হয়েছিলেন। বর্তমান ইরান এবং আফগানিস্তান তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর মতো বীর পরাক্রমী সম্রাট শুধু ভারতবর্ষে কেন অন্য দেশের ইতিহাসেও পাওয়া কঠিন। ইনি দিগ্বিজয় করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। ইনি একদিকে যেমন ছিলেন বীর পরাক্রমী অপরদিকে তেমনই ছিলেন ধর্মাত্মা, দয়ালু এবং ন্যায় বিচারক সম্রাট।

বীর বালক চণ্ড

চিতোরের সিংহাসনে তখন রানা লখা আসীন ছিলেন। আপন বীরত্বে তিনি দিল্লির বাদশাহ লোদীকে পরাজিত করেন। চারিদিকে তার কীর্তির কথা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। রানার পুত্রদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন চণ্ড আর গুণের দিক থেকেও তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। যোধপুরের সম্রাট রণমল্ল রাজকুমার চণ্ডের সঙ্গে আপন কন্যার বিবাহ প্রস্তাব দিয়ে চিতোরে রাজপ্রথা অনুযায়ী নারিকেল পাঠিয়েছিলেন। যখন যোধপুর থেকে নারিকেল নিয়ে পুরোহিত চিতোরের রাজসভায় পৌঁছলো রাজকুমার চণ্ড তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। পুরোহিত এসে যখন বলল— 'রাজকুমারের জন্য নারিকেল নিয়ে এসেছি' তখন পরিহাস করে রানা লখা বলে উঠলেন

—'আমি তো ভেবেছিলাম আপনি এই বৃদ্ধের জন্যে নারিকেল এনেছেন, আর আমার সঙ্গে রঙ্গ করছেন।' রানার কথা শুনে সকলেই হাসতে লাগল।

রাজকুমার চণ্ড সেই সময়েই রাজসভায় প্রবেশ করেছিলেন। তিনি রানার কথা শুনে বিনয়ের সঙ্গে বলে উঠলেন—'পরিহাসই সত্য, যে কন্যার জন্য নারিকেল আমার পিতা নিজের জন্য এসেছে বলে ফেলেছেন তখন সে তো আমার মা হয়ে গেছে। আমি তাকে বিবাহ করতে পারি না।'

কথাটা অত্যন্ত ফ্যাসাদের হয়ে গেল। নারকেল ফেরত দেওয়া হলে তো যোধপুরের রাজা তথা তাঁর কন্যাকে অপমান করা হয়, আবার রাজকুমার চণ্ড এ বিবাহে কোনো প্রকারেই রাজি নন। রানা তাকে অনেক করে বোঝালেন কিন্তু চণ্ড কিছুতেই রাজি হলেন না। যে ছেলে কোনোদিন পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেনি, সেই ছেলেকে এই রকম জেদ করতে দেখে রানা ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি বললেন—'এ নারিকেল ফেরত যাবে না। রণমল্লের সম্মান রক্ষার্থে আমি এই নারিকেল গ্রহণ করলাম। কিন্তু মনে থাকে যেন, এই বিবাহের ফলে যদি কোনো পুত্রসন্তান হয় তবে সেই-ই চিতোরের সিংহাসনে বসবে।'

পিতার এই কথা শুনে চণ্ডের এতটুকু ক্ষোভ হল না। তিনি ভীষ্ম পিতামহের মতো প্রতিজ্ঞা করে বলে উঠলেন—'পিতা ! আমি আপনার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি যে আমার নতুন মায়ের গর্ভে যে পুত্র জন্মাবে সেই-ই সিংহাসনে বসবে আর আমি জীবনভর তার ভালো করে যাব।' রাজকুমারের প্রতিজ্ঞা শুনে সকলে একবাক্যে তার প্রশংসা করতে লাগল।

বারো বৎসরের কন্যার সঙ্গে পঞ্চাশ বৎসরের রানা লখার বিবাহ হয়ে গেল। এই নতুন রানির গর্ভে এক পুত্রসন্তান জন্মাল, যার নাম 'মুকুল' রাখা হল। যখন মুকুলের পাঁচ বৎসর বয়স তখন মুসলমানরা গয়াতীর্থ আক্রমণ করে। তীর্থ রক্ষার জন্য রানা সৈন্য সাজালেন। এত দীর্ঘ পদযাত্রা তথা যুদ্ধ থেকে জীবন নিয়ে ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। রাজকুমার

চণ্ডকে রানা বললেন—'পুত্র ! আমি তো ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধে যাচ্ছি। তোমার এই ছোট্ট ভাই মুকুলের ভরণপোষণের কী ব্যবস্থা হবে ?'

চণ্ড উত্তর দিলেন—'চিতোরের সিংহাসন তো এরই প্রাপ্য।' পাঁচ বৎসরের ছেলে সিংহাসনে বসুক রানার ইচ্ছা ছিল না। রানা বহুপ্রকারে

চণ্ডকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু চণ্ড আপন প্রতিজ্ঞায় অটল। রানার সামনেই মুকুলকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন আর সকলের আগে তিনি তাঁকে অভিবাদন জানালেন।

রানা যুদ্ধে গেলেন আর ফিরলেন না। মুকুলকে সিংহাসনে বসিয়ে চণ্ড স্বয়ং রাজ্যের তদারকি করতে থাকলেন। তাঁর শাসনে রাজ্যের প্রজারা খুশি এবং সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠল। এত সবের পরও রাজমাতার সন্দেহ হল চণ্ড বোধহয় তার পুত্রকে সরিয়ে নিজে রাজ্য পেতে চেষ্টা করছে। তিনি সে কথা প্রকাশও করে দিলেন। যেদিন রাজকুমার চণ্ড এ কথা শুনলেন, মনে খুব দুঃখ পেলেন। তিনি রাজমাতার কাছে গিয়ে বললেন—'মা ! আপনাকে খুশি করার জন্যে আমি চিতোর ছেড়ে চলে যাচ্ছি, কিন্তু যেদিনই আপনার আমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে আমি খবর পেলেই এসে পৌঁছব।'

চণ্ডের চলে যাবার পর রাজমাতা যোধপুর থেকে তাঁর ভাইকে ডেকে আনলেন। এরপর যোধপুর সম্রাট রণমল্ল স্বয়ং বহু লোকলস্কর নিয়ে চিতোর চলে এলেন। অল্পদিনের মধ্যে তার মনোভাব বদলে গেল। তিনি তার দৌহিত্রকে মেরে চিতোর রাজ্য আত্মস্যাৎ করবার ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। রাজমাতা যখন এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেন, খুবই দুঃখ পেলেন এবং চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এখন তাঁর কোনো সাহায্যকারী নেই। তিনি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে চণ্ডকে চিঠি লিখে ক্ষমা চাইলেন আর চিতোর রক্ষার জন্য ডেকে পাঠালেন। পত্র পাওয়া মাত্র চণ্ড প্রস্তুতি শুরু করলেন। শেষে তিনি রাঠোরদের কব্জা থেকে চিতোরকে উদ্ধার করলেন। রণমল্ল এবং তার দলভুক্ত লোকেরা চণ্ডের হাতে মারা পড়ল এবং তার পুত্র বোধাজী পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করল। কুমার চণ্ড আজীবন রানা মুকুলের সেবায় কাল যাপন করলেন।

———o———

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালক প্রতাপ

মহারানা উদয় সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারানা প্রতাপ সিংহ ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা মেবারের রাজপরিবারের ধারা অনুযায়ীই হয়েছিল। অস্ত্রশস্ত্র সৈন্য পরিচালনা, মৃগয়া তথা রাজ্য পরিচালনার দক্ষতা তিনি বাল্যকালেই অর্জন করেছিলেন। রানা উদয় সিংহ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র জগমলকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। আর তাকেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করবেন বলে স্থির করেন। প্রতাপ ছিলেন পিতৃভক্ত বালক, তিনি পিতার ইচ্ছার এতটুকু বিরোধিতা করেননি। তাঁর সামনে ছিল রামায়ণের প্রাণপুরুষ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য ত্যাগ তথা বনবাসের আদর্শ। বাল্যকাল থেকেই প্রতাপের মনে এই কথাটাই বেশি বেদনাদায়ক ছিল যে ভারতভূমি বিদেশির দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে সর্বদা ছটফট করছে। তিনি সর্বদাই স্বদেশের মুক্তির কথা চিন্তা করতেন। তাঁর মাতুল ঝালোড়ের রাও অক্ষয়রাজ বালক প্রতাপকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল বালক প্রতাপ যেন রাজপরিবারের ষড়যন্ত্রের শিকার না হয়ে যায় আর এমন স্বাধীনতার পবিত্র যজ্ঞের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে না যায়।

প্রতাপ খুব সাহসী বালক ছিলেন। স্বাতন্ত্র্য এবং বীরত্বের ভাব তাঁর শিরায় শিরায় প্রবাহিত। কখনো কখনো বালক প্রতাপ ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার সঙ্গে মহারানা কুম্ভের বিজয়স্তম্ভ পরিক্রমা করতেন এবং জন্মভূমির মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলতেন—'হে চিতোরের বিজয়স্তম্ভ ! আমি বীর ক্ষত্রিয়াণীর দুগ্ধ পান করেছি, আমার রক্তে মহারানা সাঙ্গার তেজ সদা প্রবাহিত। তোমার কাছে স্বাধীনতা এবং জন্মভূমির প্রতি ভক্তির শপথ নিয়ে বলছি, বিশ্বাস করো তুমি চিরদিন সিসৌদিয়া গৌরবের বিজয় প্রতীক হয়ে মাথা উঁচু করে থাকবে। আমি থাকতে শত্রুর স্পর্শে তোমার দেহ কোনোদিন অপবিত্র হবে না।'

বালক প্রতাপ সর্বদাই রানা সাঙ্গের আদর্শ মেনে চলতেন। তিনি প্রায়ই প্রার্থনা করার সময় বলতেন—'আমি মহারানা সাঙ্গের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করব। তাঁর দিল্লি বিজয়ের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করাই আমার জীবনের

ধ্যান-জ্ঞান। সেদিন দূরে নয়, যেদিন দিল্লির বাদশাহ রানা সাঙ্গার বংশধরের কাছে মাথা নিচু করে প্রাণ ভিক্ষা চাইবে।'

প্রতাপ বাল্যকালেই কাজের দ্বারা দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে বাপ্পা রাওয়ের সন্তানের মাথা কোনোদিন কারো কাছে নত হবে না। বালক প্রতাপ রাজ্য প্রাপ্তি নয়, দেশের বন্দিদশা মোচনের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।

——o——

বীর বালক বাদল

যে সময়ের কথা সেই সময় আলাউদ্দিন খিলজী ছিল দিল্লির বাদশাহ। আলাউদ্দিন ছিল অত্যন্ত ধূর্ত আর নিষ্ঠুর বাদশা। রাজপুতনায় চিতোরের সিংহাসনে তখন রানা রত্ন সিংহ আসীন। আলাউদ্দিন শুনেছিল রানার পত্নী পদ্মিনী অপরূপ সুন্দরী। যে কোনো প্রকারে পদ্মিনীকে লাভ করার জন্যে আলাউদ্দিন এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজপুতনা যাত্রা করে চিতোর থেকে অল্প দূরে ছাউনি ফেলল। ধূর্ত আলাউদ্দিন রানার কাছে সংবাদ পাঠায় যে—'আমি আয়নার মধ্যে পদ্মিনীর প্রতিকৃতি একবার দেখেই ফিরে যাব।' মহারানা রত্ন সিংহ ভাবলেন এই সামান্যর জন্যে শুধু শুধু যুদ্ধ বাধানো সমীচীন নয়। তাই তাঁর অনুমতিতে আলাউদ্দিন দুর্গমধ্যে প্রবেশ করল। দুর্গমধ্যে রানি পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব আয়নায় দেখানো হল। ফেরার সময় তাকে পৌঁছে দিতে রানা তার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের বাইরে এলেন। দুর্গের মধ্যে আলাউদ্দিন আগে থেকেই নিজের সৈন্য লুকিয়ে রেখেছিল। তারা রানাকে আক্রমণ করে বন্দি করে ফেলল আর নিজেদের শিবিরে নিয়ে গেল।

রানা বন্দি হলে দুর্গমধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। বাদশাহের সৈন্যসংখ্যা এত বিশাল যে তার সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধ করে জেতা অসম্ভব। শেষে

পদ্মিনীর মামা গোরা এক কৌশল বার করল। আলাউদ্দিনকে খবর পাঠানো হল, 'রানি পদ্মিনী বাদশাহের কাছে যেতে রাজি, যদি তার যাওয়ার পর বাদশা রানাকে মুক্তি দেয়। রানির সঙ্গে সাতশো দাসী যাবে, শাহী সৈনিক তাদের বাধা দিতে পারবে না।' বাদশাহ্ একথা উল্লাসের সঙ্গে মেনে নিল।

সন্ধ্যাকাল, অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গ থেকে সাতশো পালকি বেরিয়ে এল। শাহী সৈনিকরা তখন বিজয় উৎসব পালনে ব্যস্ত। বাদশাহের

ছাউনিতে রানি পৌঁছিয়েই প্রথমে রানার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন আর তা সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুরও হয়ে গেল।

ভাবছো কি রানি পালকিতে বসে যবন বাদশাহের কাছে ধরা দিতে এসেছেন ? পালকিতে রানি সেজে নারীবেশে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রানির বারো বছরের ভাগ্নে সুন্দর এক বালক বাদল লুকিয়ে সেখানে এসেছিল।

অপর পালকিগুলোতেও রাজপুত সরদারগণ বসেছিল। আর পালকির বাহকরাও ছিল কাহারের ছদ্মবেশে সব রাজপুত যোদ্ধা। রানাকে মুক্ত করে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে কিছু সৈনিকের সাথে দুর্গ অভিমুখে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা আলাউদ্দিন খিলজীর সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গোরা এই বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। এই যুদ্ধে বাদল অদ্ভুত বীরত্ব দেখায়। কিন্তু অল্প সংখ্যক সৈন্য কতক্ষণ আর ওই বিশাল সমুদ্রের মতো শত্রুসৈন্যের সঙ্গে লড়তে পারে ? গোরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। দুই হাতে তলোয়ার চালিয়ে শত্রু সৈন্য কচুকাটা করতে করতে বাদল নিজেদের দুর্গে পৌঁছে গেল। আলাউদ্দিনের ইচ্ছা ছিল দুর্গে যেন যুদ্ধের খবর না পৌঁছায়। তাহলে হঠাৎ আক্রমণ করে পদ্মিনীকে ধরে নিয়ে দিল্লি পালানো যাবে। কিন্তু সেই বারো বছরের বালক তার প্রত্যেকটি চাল বানচাল করে দিল। দুর্গে খবর পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত বীরগণ সিংহবিক্রমে অস্ত্রহাতে বেরিয়ে পড়ল ধর্ম এবং স্বদেশের রক্ষায় প্রাণ বলি দিতে। বহু কষ্টে আলাউদ্দিন জয়ী হল। নিজের অধিকাংশ সৈন্যকে বলি দিয়ে যখন সে পবিত্র চিতোর দুর্গে পৌঁছলো তখন সেখানে এক বিশাল চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে আর রাজপুত রমণীরা পাপী পুরুষের স্পর্শ থেকে বাঁচতে সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে স্বর্গে চলে গেছে। ক্ষোভে আলাউদ্দিন নিজের মাথায় ঘা মারতে লাগল। ভারতের ওই গৌরবময়ী দেবভূমি সতী নারীর তেজের সঙ্গে বীর বালক বাদলের শৌর্য এবং আত্মদানে চির উজ্জ্বল হয়ে রইল।

———o———

বীর বালক প্রতাপ

এ কাহিনী মহারানা প্রতাপের নয়, এ কাহিনী চিতোরের এক সাধারণ রাজপুত বালকের। তার নামও প্রতাপ। সে গানবাজনা খুব ভালোবাসত। তার মা বাবা এবং বন্ধুরা তার উপর খুশি ছিল না। সবাই ওকে কটু কথা বলত আর রাগাত। বলত—'রাজপুতের ছেলে হয়ে তুই তলোয়ার চালানো শিখলি না। দেশে যখন সংকট দেখা দেবে তখন নিজের কর্তব্য কি করে পালন করবি ? দেশের সেবা করে না, দেশের জন্যে প্রাণ দিতে পারে না এমন রাজপুত কি কোনো কাজের মানুষ ?'

প্রতাপ তাদের কথার উত্তর দিত—'দেশের সেবা কেবল তলোয়ার দিয়েই হয় না। গানের দ্বারাও দেশের সেবা করা যায়। উপযুক্ত সময়ে দেখিয়ে দেব, প্রাণ দেওয়ার সময় কারো থেকে আমি কম যাই না।'

প্রতাপের কথা কারো ভালো লাগত না। লোকে ভাবত ওতো বাচ্চা ছেলে বটেই, একটু অহংকারীও বটে। প্রতাপও তার সিদ্ধান্তে এতই মগ্ন থাকত যে কারো কথাই কানে নিত না।

দিল্লিতে তখন মোঘলদের রাজত্ব। একবার বিশাল এক মোঘল বাহিনী চিতোর আক্রমণ করে বসে, কিন্তু চিতোর দুর্গ এতই শক্ত মজবুত যে মোঘল সৈন্য তা জয় করতে সক্ষম হচ্ছিল না। দুর্গের প্রাচীর বা দুর্গদ্বার কিছুতেই ভাঙা যাচ্ছিল না। বারবার মোঘল বাহিনী দুর্গের ভিতর থেকে রাজপুত সৈন্যের তীরের আঘাতে পিছু হটছিল।

চিতোরের যে যত যুদ্ধনিপুণ ছিল সকলেই মহারানার সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করল। কিন্তু প্রতাপ একে তো বালক তার ওপর সে অস্ত্রশস্ত্র চালানো জানত না। সে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হল না, কিন্তু অন্য কাজ বেছে নিল। সে রাজপুত সৈন্যদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বীরত্বের গান গেয়ে গেয়ে তাদের যুদ্ধে উৎসাহ দিতে লাগল। গ্রামগঞ্জেও একলাই চলে যেত। সেখানে

বীরত্বের দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শুনিয়ে যুবকদের সৈন্যবাহিনীতে সামিল হতে উৎসাহিত করত। তার গানের প্রভাবে মহারানার সৈন্যসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেল।

একদিন যখন প্রতাপ গ্রামে সেতার বাজিয়ে গান শোনাচ্ছিল তখন এক মোঘল সৈন্য লুকিয়ে তার গান শুনছিল। গান শুনিয়ে প্রতাপ যখন ফিরে আসছিল তখন সেই সৈনিকটি প্রতাপকে ধরে সেনাপতির কাছে নিয়ে আসে। মোঘল সেনাপতি প্রতাপকে পেয়ে খুব খুশি হয়। সেনাপতি বলে —'ওহে ছেলে ! আমাকে তোমার গান শোনাতে হবে।'

প্রতাপ উত্তর দেয়—'আমার কাজই তো গান শোনানো। আপনি বললে এখনি গান গাইতে প্রস্তুত।' মোঘল সেনাপতি রাত্রেই সৈন্য সাজাল, আর চিতোর দুর্গের কাছে প্রতাপকে নিয়ে এল। দুর্গদ্বারের সামনে প্রতাপকে দাঁড় করিয়ে সেনাপতি আদেশ দিল—'এখন তুমি গান করো, আমি শুনব।'

মোঘল সেনাপতি ভেবেছিল প্রতাপের গান শুনে ভিতরের লোকজন ভাববে তাদের সাহায্যের জন্যে বোধ হয় কোনো রাজপুত সৈন্য এসেছে। এই ধোঁকায় পড়ে তারা কেল্লার দরজা খুলে দেবে। প্রতাপ মোগল সেনাপতির চালাকি বুঝতে পেরেছিল। সে এমন সব গান গাইতে আরম্ভ করল যে তাই শুনে কেল্লার ভিতরে রাজপুত বীরেরা সাবধান হয়ে গেল আর তার পরই তারা মোঘল সৈন্যের উপরে ইঁট পাথর আর তীর বর্ষণ করতে আরম্ভ করে দিল। বহু সৈন্য মারা পড়ল। মোঘল সেনাপতি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করল—'এই ছোকরা ! তুই কি গান গাইছিস ?'

প্রতাপ নির্ভীক উত্তর দেয়—'আমি গানের মাধ্যমে আমাদের বীরদের বলছিলাম শত্রু দরজায় হাজির হয়েছে। ঘুমিও না। পাথর ছোড়, পাথর। শত্রুদের ধ্বংস করে দাও।'

মোঘল সেনাপতি তৎক্ষণাৎ প্রতাপের মাথাটা কেটে ফেলল, কিন্তু রাজপুতেরা সাবধান হয়ে গিয়েছিল, মোঘল সৈন্যকে ফিরে যেতে হল।

পরের দিন রাজপুতরা প্রতাপের মৃতদেহ খুঁজে পেল। দেশের জন্যে প্রাণ

উৎসর্গকারী সেই বীর বালকের দেহ চিতোরের মহারানা স্বয়ং নিজের হাতে চিতায় শুইয়ে দিলেন।

—— o ——

বীর বালক রাম সিংহ

রাঠোর বীর অমর সিংহ তেজস্বিতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি মোঘল বাদশাহ শাহজাহানের দরবারে একজন উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। একদিন বাদশাহের শ্যালক সলাবত খাঁ তাঁকে দরবারে দাঁড়িয়ে অপমান করলে অমর সিংহ সেইখানেই সকলের সামনে সলাবত খাঁয়ের মাথাটা কেটে নিয়েছিলেন। কারো সাধ্য ছিল না যে অমর সিংহকে বাধা দেয় বা তাঁকে কিছু বলে। দরবারের অন্যান্য মুসলমান সদস্যরা প্রাণ নিয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। অমর সিংহ তারপর বাড়ি ফিরে আসেন।

অমর সিংহের শ্যালক ছিল অর্জুন গৌড়। সে ছিল অত্যন্ত লোভী এবং নীচ প্রকৃতির লোক। বাদশাহ তাকে লোভ দেখালে সে অমর সিংহকে বুঝিয়ে এবং ছলনা করে বাদশাহের মহলে নিয়ে আসে। সেখানে অমর সিংহ যখন একটা ছোট দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকছিলেন, অর্জুন গৌড় তখন নিজের তরবারি বার করে পিছন থেকে তাঁকে হত্যা করে। বাদশাহ শাহজাহান এতে অর্জুন গৌড়ের উপর খুব সন্তুষ্ট হন। তিনি অমর সিংহের মৃতদেহ কেল্লার বুরুজের উপর ফেলে দেওয়ার হুকুম দেন। একজন নাম-করা বীরের দেহ এইভাবে কাক চিলের ভক্ষ্য হিসেবে ফেলে দেওয়া হল।

অমর সিংহের রানি যখন খবরটা শুনলেন তখন তিনি সতী হবার জন্যে প্রস্তুত হলেন, কিন্তু স্বামীর চিতা ছাড়া সতী কীভাবে হওয়া যাবে! রাজ অন্তঃপুরে যে কয়জন রাজপুত সৈন্য ছিল তাদের তিনি মৃতদেহ আনতে পাঠালেন, কিন্তু বাদশাহী সেনার সামনে অল্প কয়েকজন বীর কী করতে পারে ? রানি বহু সরদারকে অনুরোধ করলেন কিন্তু কেউই বাদশাহের শত্রু হতে সাহস করল না। অবশেষে রানি তলোয়ার নিয়ে আসতে বললেন এবং স্বয়ং স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে আসার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

সেই সময় অমর সিংহের ভাইপো রাম সিংহ খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। সে বলল কাকীমা তুমি থাম, আমি যাচ্ছি। হয়

কাকার দেহ নিয়ে ফিরব, না হয়তো নিজের দেহ সেখানে দিয়ে আসব।

রাম সিংহ অমর সিংহের দাদা যশবন্ত সিংহের পুত্র। সে এখন তরুণ যুবক। সতী রানি তাকে আশীর্বাদ করলেন। পনেরো বছরের সেই রাজপুত বীর ঘোড়ায় চড়ে বসল আর ঘোড়া সোজা বাদশাহের মহলে গিয়ে পৌঁছল। মহলের ফটক খোলাই ছিল। দ্বাররক্ষী কিছু বোঝার আগেই রাম সিংহ ভিতরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু বুরুজের নিচে পৌঁছতে পৌঁছতে শত শত মুসলমান সৈন্য তাকে ঘিরে ধরল। রাম সিংহের তখন বাঁচা মরার চিন্তা নেই। সে দাঁত দিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে দুহাতে তলোয়ার চালাচ্ছিল। তার সমস্ত
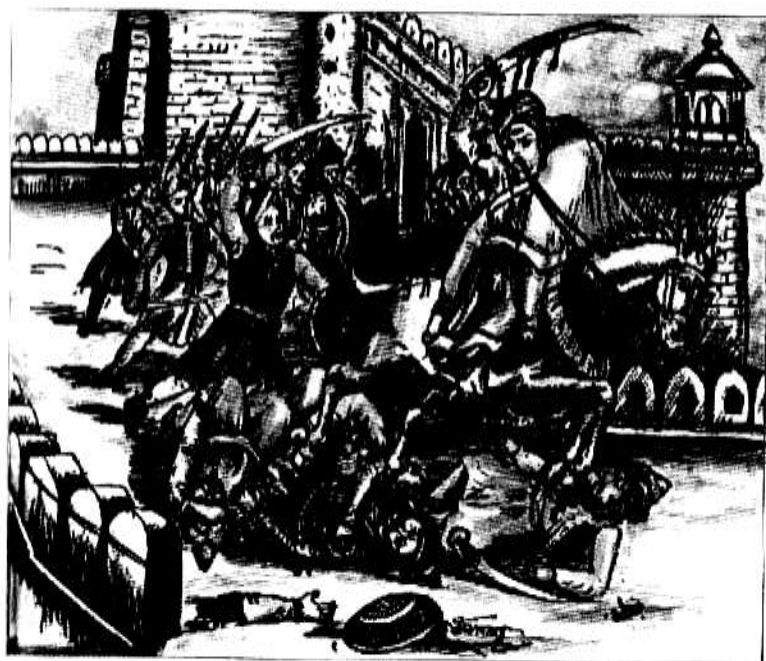
শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। প্রথমে শয়ে শয়ে পরে হাজারে হাজারে মুসলমান সৈন্য সেখানে উপস্থিত হল।

একের পর এক তাদের রক্তাক্ত দেহ মাটিতে পড়ছিল আর সেই লাশের উপর দিয়ে রাম সিংহ এগিয়ে যাচ্ছিল। সে মৃতদেহের বুকের উপর দিয়ে

বুরুজের মাথায় উঠে গেল। অমর সিংহের মৃতদেহ কাঁধের উপর উঠিয়ে নিল আর এক হাতে তলোয়ার চালাতে চালাতে নীচে নেমে এল। মৃতদেহ ঘোড়ার পিঠে রেখে সে ঘোড়ায় চেপে বসল। বুরুজের নীচে মুসলমানদের আরও সৈন্য আসার আগেই রাম সিংহের ঘোড়া কেল্লার বাইরে পৌঁছে গেল। রানি তাঁর ভাইপোর আসার অপেক্ষায় রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বামীর মৃতদেহ পেয়ে তিনি চিতা প্রস্তুত করালেন। চিতার উপর বসে সতী রানি রাম সিংহকে আশীর্বাদ করলেন—পুত্র ! গো, ব্রাহ্মণ, ধর্ম আর সতী নারীকে রক্ষার জন্যে যে বিপদকে মাথায় করে, ভগবান তার উপর খুশি হন। তুই আজ আমার মর্যাদা রক্ষা করলি। তোর খ্যাতি বিশ্ব সংসারে সর্বদা উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

———o———

নির্ভীক বীর বালক শিবাজী

পরবর্তীকালে যে শিক্ষার দ্বারা তিনি (শিবাজী) হিন্দু ধর্মের সংরক্ষক ছত্রপতি হয়েছিলেন, সেই শিক্ষা তাঁর বাল্যকালেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

সমস্যাই জীবনে নানা গঠনমূলক পরিবর্তন এনে দেয় আর শিবাজীর বাল্যকাল কেটেছে বহু সমস্যার মধ্য দিয়ে। শিবনের গিরিদুর্গে ১৬৩০খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। পিতা শাহজী ছিলেন বীজাপুর নবাবের অধিনে এক রাজকর্মচারী। বীজাপুর নবাবের পক্ষে শাহজী যখন আহম্মদ নগরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত, তখন মালদার খাঁ দিল্লির বাদশাহকে খুশি করার জন্য বালক শিবাজী এবং তাঁর মা জীজাবাঈকে সিংহগড়ে বন্দি করার চেষ্টা করে, যদিও তার এই অপচেষ্টা সার্থক হয়নি।

শিবাজীর শৈশবের তিন বৎসর তার জন্মস্থান শিবনের দুর্গে কাটে।

তারপর শত্রুর ভয়ে জীজাবাঈকে শিশুপুত্র কোলে বারবার এক দুর্গ থেকে আর এক দুর্গে ছুটে বেড়াতে হয়েছে। এই রকম কঠিন পরিস্থিতিতেও কিন্তু বীর মাতা পুত্রের সৈনিক জীবন গঠনে কোনো ত্রুটি করেননি।

মা জীজাবাঈ শিবাজীকে রামায়ণ, মহাভারত, তথা পুরাণের নানা বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী পড়ে শোনাতেন। নারো, ত্রিমল, হনুমন্ত, তথা গোমাজী শিবাজীর শিক্ষাগুরু ছিলেন আর শিবাজীর অভিভাবক ছিলেন বীর দাদাজী কোণ্ডদেব। এই শিক্ষার ফলে শিবাজী শৈশবকাল থেকেই সাহসী এবং অদম্য হয়ে ওঠেন। শিবাজী বীর মাওলী জাতির বালকদের নিয়ে দল গঠন করে তার নেতৃত্ব দিতেন, আর যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা খেলতেন। বাল্যকাল থেকেই গো, ব্রাহ্মণ, দেবমন্দির, তথা হিন্দু ধর্মকে বিধর্মীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন।

শাহজী চাইতেন তাঁর পুত্রও বীজাপুর দরবারের দাক্ষিণ্য লাভ করুক। শিবাজীর যখন আট বৎসর বয়স তখন একদিন তাঁর পিতা তাকে বীজাপুর দরবারে নিয়ে যান। পিতা ভেবেছিলেন দরবারের সাজসজ্জা, চাকচিক্য, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি দেখে বালক অবাক হয়ে যাবে, আর দরবারের প্রতি তার আকর্ষণ বাড়বে। কিন্তু শিবাজী কোনো দিকে না চেয়ে, কোনো দিকে মন না দিয়ে পিতার সঙ্গে এমনভাবে যাচ্ছিলেন যেন সাধারণ রাজপথে চলেছেন। নবাবের সামনে পৌঁছে শাহজী শিবাজীর পিঠে হাত দিয়ে বললেন —'পুত্র! বাদশাহকে নমস্কার করো।' উত্তরে বালক পিতার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, আর বলল—'বাদশাহ আমার মনিব নন। আমি এর সামনে মাথা নোয়াতে পারব না।'

দরবারে নিঃশব্দতা ছেয়ে গেল। নবাব বালকের দিকে চেয়ে রইলেন, কিন্তু শিবাজী চোখ নামালেন না। শাহজী বিনীতভাবে বললেন—'শাহেনশা! এ এখনও বালক ; একে ক্ষমা করুন।' বাদশাহ ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য আদেশ করলেন। বালক পিছন ফিরে নির্ভিকভাবে দরবার থেকে

বেরিয়ে গেল। বাড়ি ফিরে শাহজী যখন ছেলেকে তার ধৃষ্টতার জন্য ধমকাচ্ছেন, তখন শিবাজী উত্তর দেন—'বাবা! তুমি আমাকে ওখানে নিয়ে

গেলে কেন ? আমার মাথা মা ভবানী আর তোমাকে ছেড়ে আর কারো সামনে নত হবে না।' শাহজী নির্বাক হয়ে গেলেন।

এই ঘটনার চার বৎসর পর আর এক ঘটনা ঘটল। সেই সময় শিবাজীর বয়স বারো বৎসর। একদিন বালক শিবাজী বীজাপুরের প্রধান রাস্তার উপর ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সেই সময় এক কসাই একটা গাভীকে দড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল। গাভীটি প্রাণপণে চিৎকার করছিল, আর এদিক-সেদিক কাতর চোখে চাইছিল। কসাই তাকে লাঠি দিয়ে বেদম মারছিল। দুধারে হিন্দু দোকানদার যারা ছিল, তারা মাথা নিচু করে বসেছিল। তাদের এতটুকু সাহস নেই যে প্রতিবাদ করে। মুসলমানের রাজত্বে বাস করে প্রতিবাদ করলে কি থেকে কি হয় বলা যায় না! কিন্তু তারা অবাক চোখে তাকিয়ে রইল যখন বালক শিবাজীর খাপ থেকে নিস্কাশিত তলোয়ারটি ঝকমক করে উঠল। তিনি লাফিয়ে কসাই-এর কাছে গিয়ে গাভীটির গলার দড়িটা কেটে দিলেন। গাভী তো একদিকে পালিয়ে বাঁচল, কিন্তু কসাইটি এই ঘটনায় ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বালকের উপর ঝাপিয়ে পড়ল তাঁকে হত্যা করবে বলে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর হাতেই সে উপযুক্ত প্রতিফল লাভ করল।

দরবারে খবরটা পৌঁছলে নবাব রেগে রক্তচক্ষু হয়ে শাহজীকে বললেন —'তোমার ছেলে খুব অত্যাচারী মনে হচ্ছে। শাহজী ! তুমি ওকে বীজাপুর থেকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দাও।' শাহজী তার আদেশ মাথা পেতে নিলেন। শিবাজীকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তারপর এমন একদিন এল, যেদিন বীজাপুরের নবাব স্বাধীন হিন্দু সম্রাট হিসাবে শিবাজীকে নিজের রাজ্যে নিমন্ত্রণ করলেন আর শিবাজী হাতির পিঠে চড়ে দরবারে পৌঁছলেন। সেদিন নবাব নিজে এগিয়ে এসে তাঁকে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানিয়েছিলেন।

———o———

বীর বালক ছত্রসাল

পন্নাধিপতি চম্পত রাও ছিলেন অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পুরুষ। বিক্রম সংবৎসর ১৭০৬ সালের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথীতে ময়ূর পাহাড়ের জঙ্গলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছত্রসালের জন্ম হয়।

মোঘল সম্রাট শাহজাহানের সৈন্যবাহিনী চারিদিক থেকে জঙ্গল ঘিরে ফেলার চেষ্টা করেছিল। লুকিয়ে থাকা প্রয়োজন ভেবে পুত্রের জন্ম উপলক্ষে মহারাজ কোনো উৎসব পালন করেননি। একবার তো শত্রু এত নিকটে এসে গিয়েছিল যে লোকজনকে প্রাণ বাঁচাতে লুকিয়ে থাকার জন্যে এখানে ওখানে ছুটে পালাতে হয়েছিল। এই ছোটাছুটির সময় শিশু ছত্রসাল কখন একলা জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু 'রাখে হরি মারে কে ?' বালক ছত্রসালের উপর শত্রুর নজর পড়ল না। ভগবান শিশুটিকে রক্ষা করলেন। চার বছর বয়স পর্যন্ত তাকে মাতামহের আশ্রয়ে বাস করতে হয়েছিল আর পিতার কাছে থাকতে পেয়েছিলেন মাত্র সাত বছর বয়স পর্যন্ত। পাঁচ বছর বয়সে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে রাম-লক্ষ্মণের মূর্তিকে নিজের মতো জীবন্ত বালক মনে করে তাদের সঙ্গে খেলতে চেয়েছিলেন। শোনা যায় ভগবান সত্যি সত্যি তার সঙ্গে খেলা করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত ছত্রসালকে মাতামহের আশ্রয়েই থাকতে হয়েছিল। এরপর তিনি পান্না শহরে ফিরে আসেন, সেখানে কাকা সুজন রাও তাকে খুব গোপনে সতর্কতার সঙ্গে অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত করে তোলেন। ছত্রসাল উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার শৌর্যের অধিকারী হয়েছিলেন। জীবদ্দশায় তিনি পিতার সংকল্পকে বাস্তবায়িত করেছিলেন। ছত্রসালকে পেয়ে পান্না-রাজ্য ধন্য হয়ে গিয়েছিল।

আওরঙ্গজেব তখন দিল্লির সিংহাসনে বসেছেন। তাঁর অত্যাচারে সারা

দেশ আতঙ্কগ্রস্ত। ছত্রসালের বয়স তখন প্রায় তেরো বৎসর। দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে মেলা চলছে। চারিদিকে আনন্দের কোলাহল। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ দেবীদর্শন করতে আসছে। মহারাজ সুজন রাও বুন্দেল

সর্দারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। যুবরাজ ছত্রসাল জুতো খুলে হাত-পা ধুয়ে একখানি ফুলের সাজি নিয়ে পূজার ফুল তুলতে বাগানে ঢুকেছেন। তাঁর সঙ্গে তারই সমবয়সী কয়েকজন রাজপুত বালক। ফুল তুলতে তুলতে তিনি বাগানের কিছু দূরে চলে গেলেন। এই সময় সেখানে কয়েকজন মুসলমান সৈনিক ঘোড়া চড়ে এসে হাজির হল। কাছে এসে তারা ঘোড়া থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করে—'বিন্ধ্যবাসিনী মন্দির কোন্ দিকে ?' প্রত্যুত্তরে ছত্রসাল বললেন— 'কেন ? তোমরা কি দেবীর পূজা দেবে ?' মুসলমান সর্দার বলে— 'আরে ছিঃ ! আমরা তো মন্দির ধ্বংস করতে এসেছি।' ছত্রসাল ফুলের সাজি অপর বালকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে গর্জে উঠলেন—'খবরদার ! মুখ সামলে কথা বল। নইলে ফের এ কথা বললে জিভটা টেনে ছিঁড়ে ফেলব।' সর্দার হেসে উঠল, বলল— 'তোর কী করার ক্ষমতা আছেরে ? তোর দেবীও ....।' কিন্তু বেচারার কথা শেষ না হতেই ছত্রসালের তলোয়ার তার বুক এ ফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। ওই পুষ্প উদ্যানে একটা যুদ্ধ বেধে গেল। সঙ্গী যে বালকদের হাতে তলোয়ার ছিল না তারা দৌড়ে তলোয়ার আনতে চলে গেল।

যুদ্ধের খবর মন্দিরে পৌঁছলে রাজপুতরা কবচ পরে তলোয়ার হাতে নিল, কিন্তু তারা দেখল যুবরাজ ছত্রসাল এক হাতে রক্তে মাখা তলোয়ার আর অপর হাতে ফুলের সাজি নিয়ে হাসতে হাসতে সেই দিকেই আসছেন। তাঁর পোশাক রক্তে লালে লাল। যুবরাজ একলাই শত্রু সৈন্যদের ধরাশায়ী করে দিয়ে এসেছেন। মহারাজ সুজন রাও ছত্রসালকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দেবী বিন্ধ্যবাসিনীও আজ তাঁর যোগ্য পূজারীর হাতে শৌর্যপুষ্পের পূজা পেয়ে তৃপ্ত হলেন।

———০———

বীর বালক দুর্গাদাস রাঠোর

যোধপুররাজ যশবন্ত সিংহকে তাঁর এক উটরক্ষী খবর দিল যে একটা সাধারণ কৃষকের ছেলে তাদের একটা উটকে মেরে ফেলেছে। মহারাজা সেই কৃষককে ধরে নিয়ে আসার হুকুম দিলেন। কৃষকটির নাম আসকরণ। সে রাঠোর বংশীয় রাজপুত। মহারাজের কাছে এসে সে তার ছেলেকে সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল—'মহারাজ ! এই ছেলে অপরাধী।' মহারাজ রেগে গিয়ে ধমক দিয়ে বললেন—'উটটা তুমি মেরেছ ?' বালক নির্ভয়ে উত্তর দিল—'হ্যাঁ মহারাজ মেরেছি। আমি আমার ক্ষেত পাহারা দিচ্ছিলাম। উটগুলোকে আসতে দেখে দৌড়ে গিয়ে যারা উট চরাচ্ছিল তাদের মানা করলাম। কিন্তু ওরা আমার কথা শুনল না। ফসল নষ্ট হয়ে গেলে খাব কী ? সেই জন্যে যখন দেখলাম একটা উট আমার জমিতে মুখ লাগিয়েছে, তখন আমি ওটাকে মেরে ফেলি। বাকি উটগুলো আর সঙ্গের লোকগুলো তখন ওখান থেকে পালিয়ে যায়।'

ছোট একটা ছেলে এমন শক্তসমর্থ উটকে মারতে পারে মহারাজ একথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি উটটাকে কী করে মারলে ?' ছেলেটি এদিক ওদিক তাকাল, দেখল একটা উট মালপত্র পিঠে করে নিয়ে যাচ্ছে। সে উটটার কাছে গিয়ে কোমর থেকে তলোয়ার বার করে এমন কোপ মারল যে উটের গর্দান আলাদা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মহারাজা ছেলেটির বীরত্ব দেখে যারপরনাই আনন্দিত হলেন। তিনি তাকে নিজের কাছে কাজে বহাল করে নিলেন।

এই বালকই হল ইতিহাস বিখ্যাত বীর দুর্গাদাস। আওরঙ্গজেবের মতো নিষ্ঠুর বাদশাহের কবল থেকে ইনিই যশবন্ত সিংহের রানি এবং যুবরাজ অজিত সিংহকে রক্ষা করেছিলেন। মারওয়াড় রাজ্যকে ইনিই মুসলমানদের

হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

বীর বালক পুত্ত

এক সময় দিল্লির বাদশাহ আকবর তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে চিতোর অধিকার করতে এসেছিলেন। চিতোরের রানা উদয়সিংহ ভয়ে চিতোর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন। তাঁর সেনাপতি জয়মল চিতোর দুর্গ রক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু একদিন রাত্রে আকবর বাদশাহ দূর থেকে কামানের গুলিতে তাঁকে হত্যা করেন। এতে চিতোরবাসী খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই সময়ে চিতোরের এক অসম সাহসী বালক স্বদেশকে রক্ষা করার জন্যে যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসে।

বালকটির নাম পুত্ত। তার বয়স তখন মাত্র ষোলো বৎসর। পুত্ত বালক হলে কি হবে সে সাহসে মহা মহা বীরদের সমকক্ষ আর শক্তিমান। তার মা বোন এবং স্ত্রী যুদ্ধে যাবার জন্য তাকে হাসতে হাসতে অনুমতি দেয়। শুধু তাই নয় তারাও তখন ঘরে বসে না থেকে অস্ত্র হাতে নিজের দেশকে রক্ষা করার জন্য উৎসাহ ভরে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে পড়ে।

বাদশাহের সৈন্যবাহিনী দুভাগে ভাগ হয়ে এক ভাগ পুত্তর সঙ্গে যুদ্ধ করছিল আর এক ভাগ অন্যদিক থেকে পুত্তকে আক্রমণ করতে আসছিল। এই দ্বিতীয় দলের সৈন্যরা পুত্তর মা, বোন আর স্ত্রীর বীরত্ব দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। বেলা দ্বিপ্রহরে পুত্ত তাদের কাছে পৌঁছে দেখে তার বোন যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে, মা এবং স্ত্রী কামানের গোলায় আহত হয়ে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। পুত্তকে কাছে ডেকে মা বলল—'বাবা ! আমি স্বর্গে যাচ্ছি, তুই যুদ্ধ ছাড়িস না। লড়াই করে জন্মভূমিকে রক্ষা করবি, না হলে যুদ্ধে শহিদ হবি, স্বর্গে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা হবে।' এই কথাগুলি বলে পুত্তর মা চোখ বুজল। পুত্তর স্ত্রীও শান্ত চোখে পুত্তর দিকে একবার মাত্র চাইল তারপর সেও চোখ বুজল। পুত্ত এবার প্রবল উৎসাহে আর বীরত্বের সঙ্গে পুনরায় শত্রুর সামনাসামনি হল। মায়ের আদেশ পালন করতে তার পা একবারও পিছলো না। সে জন্মভূমির রক্ষার্থে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন করল। এইভাবে

একই পরিবারের চার-চারজন বীর নরনারী স্বর্গযাত্রা করল। আর তাদের অমর কীর্তি চিরদিনের জন্য মানুষের হৃদয়ে গাঁথা রয়ে গেল।

বীর বালক অজিত সিংহ এবং জুঝার সিংহ

গুরু গোবিন্দ সিংহ ছিলেন আনন্দপুর কেল্লার ভিতর। তার সুরক্ষায় যতজন শিখ সৈন্য ছিল তার বিশগুণ অধিক মুসলমান সৈন্য কেল্লাকে ঘিরে রেখেছিল। কেল্লার ভিতরে খাদ্যসামগ্রী যা ছিল ক্রমে শেষ হতে লাগল। শিখ সরদারগণ গুরুজীকে বারবার অনুরোধ করতে লাগল —'আপনি নাবালকদের নিয়ে নিঃশব্দে এখান থেকে চলে যান। দেশ এবং জাতিকে বিধর্মীর হাত থেকে রক্ষা করতে আপনার সুস্থভাবে বেঁচে থাকা একান্ত প্রয়োজন।'

নিজের সঙ্গীদের অনেক অনুনয়ের পর গুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁর স্ত্রী এবং চার পুত্রকে নিয়ে নিঃশব্দে কেল্লার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁরা নিরাপদে বেশিদূর এগোতে পারলেন না, কারণ মুসলমান সৈন্যরা তাঁর স্থানান্তরিত হওয়ার খবর পেয়ে যায়। অশ্বারোহী শত্রুসৈন্য মশাল হাতে চারদিকে সন্ধান করতে লাগল। তাদের হাত থেকে এড়িয়ে যেতে গুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁর দুই ছেলে অজিত সিংহ, জুঝার সিংহ আর স্ত্রী, এবং অন্যদিকে তার মা এবং দুই ছোট ছেলে জেরাবর সিংহ আর ফতেহ সিংহ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

গুরুজী যাতে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারেন সে জন্যে কেল্লার ভিতর যত শিখ সৈন্য ছিল সবাই কেল্লা থেকে বেরিয়ে এসে মুসলমান সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাত্রির অন্ধকারে এক ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। অল্প সংখ্যক শিখ সৈন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগল। মুসলমান সৈন্য গুরুজীকে অনুসরণও করছিল। গুরুজীর সঙ্গে যে কয়েকজন সৈন্য ছিল, তারা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শেষ হয়ে গেল। গুরুজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অজিত সিংহ এ দৃশ্য দেখতে পারল না। সে পিতার কাছে এসে প্রণাম করে বলল—'পিতা ! শিখ সৈন্যরা আমাদের রক্ষা করতে যুদ্ধে প্রাণ দিচ্ছে, এমতাবস্থায় আমি তাদের এভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারি না। আপনি আমাকে যুদ্ধের অনুমতি দিন।'

পুত্রের কথা শুনে গুরুজী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আর বললেন —'পুত্র ! তুমি ধন্য। নিজের দেশ এবং ধর্ম রক্ষার জন্যে মৃত্যুবরণকারী চির অমর। যাও নিজের কর্তব্য পালন করো।'

অজিত সিংহ আট-দশজন শিখ সৈন্য নিয়ে শত্রু সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার আক্রমণ শত্রুর পক্ষে সাক্ষাৎ যমরাজের ন্যায় ভয়ংকর আক্রমণ বলে মনে হল। কিন্তু এত বড় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে আট-দশজন আর কী করতে পারে ? তবু হাজার হাজার সৈনিককে ধরাশায়ী করে তারা বীরগতি প্রাপ্ত হল। বড় ভাই-এর যুদ্ধে পতনের পর তার থেকে ছোট জুঝার সিংহ গুরুজীকে প্রণাম করে বলল— 'পিতাজী ! আমাকেও অনুমতি দিন যাতে আমিও দাদার অনুগামী হতে পারি।'

ধন্য সেই সব পুত্র যারা এই রকম দেশ এবং ধর্মের জন্য আত্মবলিদানে উৎসাহী আর ধন্য সেই পিতা যিনি আপন পুত্রদের এই রকম আত্মবলি দিতে খুশি হয়ে আশীর্বাদ করেন। গুরুজী জুঝার সিংহকে আশীর্বাদ করলেন, বললেন — 'যাও বেটা ! ভগবান তোমার সহায় হন। তুমি অমরত্ব লাভ করো।'

জুঝার সিংহও তার কতিপয় জীবিত সঙ্গীদের নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে

পড়ল। একান্ত ক্ষুধার্ত শিখ সৈন্য আর জুঝার সিংহ তো এখনো বালক ; তবু যখন তারা লড়াই করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে ভূমিশয্যা নিল, তখন পর্যন্ত এত বেশি শত্রু সৈন্য নিহত হয়েছিল যে মুসলমান সৈন্যদের আর সাহস হয়নি গুরু গোবিন্দ সিংহকে অনুসরণ করবে।

বীর বালক পৃথ্বী সিংহ

দিল্লির মোঘল বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের কাছে এক শিকারি জঙ্গল থেকে একটা ভয়ংকর বাঘ ধরে এনেছিল। বাঘটা লোহার খাঁচায় আটকানো ছিল আর ঘন ঘন গর্জন করছিল। বাদশাহ্ বললেন— 'এর চেয়ে বড় আর এত ভয়ংকর বাঘ বোধ হয় দুটি মিলবে না।'

বাদশাহের পারিষদদের সকলেই সে কথায় সায় দিল। কিন্তু মহারাজা যশবন্ত সিংহ বললেন—এর চেয়ে শক্তিশালী বাঘ আমার কাছে আছে। একথা শুনে বাদশাহের অত্যন্ত রাগ হল। তিনি বললেন—'আপনার বাঘকে এর সঙ্গে লড়াই করতে দিন। দেখব, যদি আপনার বাঘ হেরে যায় তবে আপনার গর্দান নেব। যশবন্ত সিংহ বাদশাহের কথায় রাজি হয়ে গেলেন। পরের দিন দিল্লির কেল্লার সামনের মাঠে মোটা লোহার জালের এক মস্ত খাঁচা দুটি বাঘের লড়াই করার জন্য আনা হল। বাঘের লড়াই দেখতে খুব ভীড় জমে গেল। বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব যথা সময়ে এসে সিংহাসনে বসলেন। রাজা যশবন্ত সিংহ নিজের দশ বৎসরের ছেলে পৃথ্বী সিংহকে সঙ্গে এনেছিলেন। তাঁকে দেখে বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন— 'কই ! আপনার বাঘ কোথায় ?' যশবন্ত উত্তর দিলেন—'আমি আমার বাঘ সঙ্গেই এনেছি। আপনি লড়াই আরম্ভ করতে হুকুম দিন। বাদশাহের হুকুমে জঙ্গলী বাঘটাকে খাঁচা থেকে বার করে লড়াই-এর জন্যে যে খাঁচা আনা হয়েছিল তার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হল। যশবন্ত সিংহ ছেলেকে ওই খাঁচায় ঢুকে যেতে বললেন। বাদশাহ এবং সেখানে উপস্থিত সকলে তো থ হয়ে রইল। কিন্তু দশ বৎসরের বালক পৃথ্বী সিংহ্ পিতাকে প্রণাম করে হাসতে হাসতে বাঘের খাঁচায় ঢুকে গেল।

বাঘটা পৃথ্বী সিংহকে একবার দেখেই লেজ নামিয়ে পিছিয়ে গেল, কিন্তু শিকারিরা বাইরে থেকে বল্লমের ডগা দিয়ে তাকে খোঁচা দিয়ে রাগিয়ে দিচ্ছিল। বাঘটা রেগে গর্জে উঠে পৃথ্বী সিংহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বালক পৃথ্বী সিংহ তড়িৎগতিতে এক দিকে সরে গেল আর কোমর থেকে নিজের

তলোয়ারটা বার করল। ছেলেকে তলোয়ার বার করতে দেখে যশবন্ত সিংহ চিৎকার করে উঠলেন—'পুত্র ! তুই এ কী করছিস ? বাঘের কাছে তো তলোয়ার নেই, তবে কি তুই ওর ওপর তলোয়ার চালাবি ? তাতো ধর্মযুদ্ধ নয়।'

বাবার কথা শুনে পৃথ্বী সিংহ তলোয়ারখানা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সেই ছোট্ট বালক বাঘের থুতনিটা ধরে দু-ফাঁক করে দিল আর বাঘের

শরীরটাকেও দু-ফাঁক করে চিরে ফেলে ছুড়ে দিল।

দর্শকেরা পৃথ্বী সিংহের জয় জয়কার করতে লাগল। বাঘের রক্তে রঞ্জিত পৃথ্বী সিংহ যখন খাঁচার বাইরে বেরিয়ে এল, যশবন্ত সিংহ দৌড়ে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

—o—
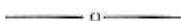
বীর বালক জালিম সিংহ

এ কাহিনী যখনকার তখন সরফরাজ খাঁ মুর্শিদাবাদে রাজত্ব করছিলেন। নবাব সরফরাজ খাঁ জনগণের ভালোবাসা অর্জন করতে পারেননি। সেই কারণে তাঁর বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

ষড়যন্ত্রকারী দলের নায়ক ছিলেন আলীবর্দী খাঁ। তিনি এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে সরফরাজ খাঁয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। সরফরাজ খাঁ বিচলিত হয়ে পড়লেও লড়াই করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না।

উভয় পক্ষের সৈন্য গিরিয়ার মাঠে ছাউনি ফেলে। পাশেই ভাগীরথী নদী কুলুকুলু শব্দে বয়ে যাচ্ছিল। নদীর দুপাশেই সৈন্যদের তাঁবু ; সাদা তাঁবুর ছাউনিতে ভাগীরথীর জলে মনোরম প্রতিচ্ছবি ভাসছিল।

রাত্রি শেষ, প্রভাত হল। চারিদিক আলোময় হয়ে উঠল। সূর্য ওঠার আগেই যুদ্ধের ঘণ্টা বেজে উঠল। যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় প্রান্তে দুপক্ষের সৈন্য। যুদ্ধ আরম্ভ হল।

সরফরাজ খাঁ হাতির পিঠে বসেছিলেন আর তাঁর প্রধান সেনাপতি মারা পড়ায় তিনি নিজে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তার বুকে শত্রুপক্ষের গুলি লাগল। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। মুর্শিদাবাদের নবাব পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে কেবল সরফরাজ খাঁই নিহত হলেন।

বিজয় সিংহ নামে তাঁর এক রাজপুত যোদ্ধা ছিল। সে সৈন্যবাহিনীর

পিছনের দিক পাহারা দিচ্ছিল। গিরিয়ার কাছে খোমরা নামক স্থানে সে অপেক্ষা করছিল। নবাবের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সে তৎক্ষণাৎ আলীবর্দী খাঁর সম্মুখীন হল। সরফরাজ খাঁর মৃত্যুতে রাজপুত বীরের রক্ত টগবগিয়ে উঠল। সে একখানা বল্লম নিয়ে আলীবর্দীর দিকে তাক করে ছুড়ল কিন্তু তার আগেই শত্রুপক্ষের এক গোলন্দাজ সৈন্য বিজয় সিংহকে তাক করে গুলি ছুড়ল। সে সেখানেই পড়ে গেল। গিরিয়ার যুদ্ধে সে তার প্রাণ বলি দিল।

বিজয় সিংহের নয় বৎসরের এক পুত্র ছিল। নাম জালিম সিংহ। এই

যুদ্ধে সে পিতার সঙ্গে ছিল। যখন বিজয় সিংহ ঘোড়া থেকে পড়ে গেল তখন জালিম সিংহ তার খোলা তলোয়ার নিয়ে পিতার মৃত দেহ রক্ষার জন্য সেখানে দৌড়ে গেল। চারিদিকে আলীবর্দীর সৈন্যরা জয়ধ্বনি দিতে লাগল, রণভেরীর শব্দে চারিদিক কেঁপে উঠছিল, কিন্তু ওই নয় বৎসরের বালক এতটুকুও ভয় পেল না। নিজের ছোট্ট তলোয়ারখানা নিয়ে সিংহ শিশুর মতো সে গর্জন করতে লাগল। পিতার দেহ যেন শত্রুতে স্পর্শ করতে না পারে তার জন্য প্রাণের মায়া না করে নির্ভীকভাবে সে তলোয়ার ঘুরিয়ে চলল। শত্রু সৈন্য তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল কিন্তু বীর বালক এতটুকুও পিছলো না। নিজের তলোয়ার চারপাশে চালাতে লাগল।

আলীবর্দী খাঁ স্বয়ং সেখানে হাজির ছিলেন। বালকের অদ্ভুত সাহস আর পিতৃভক্তি দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি বিজয় সিংহের মৃতদেহ উপযুক্তভাবে দাহ-সৎকারের জন্যে হুকুম দিলেন। সৈন্যরা বালক জালিমের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাকে কাঁধে করে নিয়ে গেল। ভাগীরথীর তীরে জালিম তার পিতার দাহ-সৎকার করে তার পবিত্র চিতাভস্ম গঙ্গায় বিসর্জন দিল। পুণ্যসলিলা ভাগীরথী সেই পবিত্র চিতাভস্ম বুকে নিয়ে কলধ্বনি করতে করতে বয়ে চলল আর পিতৃহারা বালক জালিম ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁবুতে ফিরে গেল।

মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে গিরিয়ার যুদ্ধ সুপ্রসিদ্ধ, রাজপুত বালক জালিমের কাহিনী তার থেকেও প্রসিদ্ধ।

যে জায়গায় দাঁড়িয়ে জালিম তার বীরত্ব দেখিয়েছিল, সে জায়গার নাম আজও জালিম সিংহের মাঠ বলে পরিচিত।

———o———

বীর বালক জেরাপুর নরেশ

হায়দ্রাবাদের নিকটে জেরাপুর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে জেরাপুরের রাজা ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে আরবি আর রোহিলা পাঠানদের নিয়ে এক সৈন্যবাহিনী গঠন করেন ; কিন্তু রাজা তখন বালকমাত্র। সেই সময়ে হায়দ্রাবাদের নিজামের এক মন্ত্রী সালারজং বিশ্বাসঘাতকতা করে বালক রাজাকে বন্দি করে ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়।

কর্নেল মেটোজ টেলর বলে এক ইংরেজ অফিসারের সঙ্গে এই রাজার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। রাজা তাকে 'আপ্পা' বলে ডাকত। কর্নেল টেলর রাজার সঙ্গে কয়েদখানায় দেখা করে বালক বলে তাকে লোভ দেখাতে থাকে যে, 'তুমি যদি বিদ্রোহীদের নাম বলে দাও তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।'

কিন্তু বিশ্বাসী এবং সাহসী ছেলে নিজের দলের সঙ্গে বেইমানি করবে না। রাজা উত্তরে বলল—'আপ্পা ! আমি কারো নাম বলতে পারব না। নিজের প্রাণের বিনিময়েও স্বদেশী ভাইদের কোনোক্রমেই বিপদে ঠেলে দেব না। আমি তো আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি না। অপরের দয়ায় কাপুরুষের মতো বেঁচে থাকতে ভালো লাগে না।'

কর্নেল টেলর বললে—'তুমি কী জানো তোমাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে ?' রাজা বলল—'হ্যাঁ, আমি জানি, কিন্তু তোমাকে একটা অনুরোধ, যদি রাখ তবে বলি। আমাকে ফাঁসিতে চড়িও না। আমি চোর নই। তোপের মুখে আমাকে উড়িয়ে দিও। তুমি দেখতে পাবে তোপের মুখে আমি কেমন নির্ভীকভাবে দাঁড়িয়ে থাকি।'

কর্নেল টেলরের সুপারিশে রাজাকে স্বল্পবয়সী বালক বলে দ্বীপান্তর দেওয়া হয়। দণ্ডাদেশ শুনে রাজা বলল—'দ্বীপান্তর বা জেলে জীবন কাটানো তো এখানকার পাহাড়ে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষরাও পছন্দ করে না, আমি

তো রাজা। দ্বীপান্তরের বদলে আমি মৃত্যুকে বেশি ভালোবাসি। এই বলে রাজা একজন ইংরেজ রক্ষীর হাত থেকে ঝট করে একটা পিস্তল ছিনিয়ে নিয়ে নিজের বুকে গুলি করে বসল।

এক সুকুমার বালকের এইরূপ বীরত্ব দেখে ইংরেজরা তার প্রশংসা না করে পারল না।

—o—

সত্যসন্ধানী বালক সক্রেটিস

ইউনান প্রদেশের এথেন্স নগরে এক অতি সাধারণ গরিব গৃহস্থের ঘরে ৪৬৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের জন্ম হয়। পিতার নাম এফ্রোনিক্স, মাতার নাম ফিনেরিট। পিতা এফ্রোনিক্স এথেন্সের এক পাথরের খনিতে মজুরের কাজ করতেন। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে দিনের শেষে যা আয় করতেন তাই দিয়ে কোনো রকমে তার ছোট্ট পরিবারটির ভরণ-পোষণ করতেন। সক্রেটিস বাল্যকাল থেকেই ছিলেন খুব মেধাবী আর

চিন্তাশীল। তাঁর পিতা তাঁকে এথেন্সের এক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন যাতে তাঁর ছেলে কিছু পড়াশুনা শিখতে পারে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সক্রেটিসের বুদ্ধি এবং শেখবার আগ্রহ দেখে তাঁকে বিনা বেতনে স্কুলে পড়বার সুযোগ করে দেন। সক্রেটিস ছিলেন খুবই সহজ-সরল। অভাব-অনটনের জন্য মাঝে মধ্যে তাঁকে বন্ধুদের বাড়ি গিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে হত। বাল্যকাল থেকেই সক্রেটিসের সংগীত এবং বিজ্ঞানের প্রতি ঝোঁক বাড়তে থাকে। তখনকার দিনে এথেন্স ছিল বড় বড় কবি-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং সংগীতকারদের বাসস্থান। সক্রেটিস এই সব জ্ঞানীগুণীদের সংস্পর্শে থাকতে ভালোবাসতেন। যখনই সুযোগ পেতেন তিনি এইসব গুণী মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন।

সক্রেটিস দেখতে খুব সুদর্শন ছিলেন না। তাঁর চ্যাপ্টা নাক, বড় বড় চোখ আর পরনে মোটা একখানা ছেঁড়া বিছানার চাদর কিংবা ছেঁড়া পট্টিমারা পাতলুন, তার উপর খালি পায়েই তিনি সারাটা শহর চষে বেড়াতেন। তাই দেখে লোকে তাঁর প্রতি না তাকিয়ে পারত না। তাঁর বিশ্রী চেহারার মধ্যে থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা প্রতিভাদীপ্ত এক উজ্জ্বলতা মানুষের চোখে সহজেই ধরা পড়ত। সক্রেটিসের জানার অদম্য কৌতূহল, দার্শনিকসুলভ চিন্তাধারা, সেই মতো কথাবার্তা শুনে মানুষ তাঁর প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হত। সত্যের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস বাল্যকাল থেকেই দানা বাঁধতে শুরু করে। প্রত্যেকটি বস্তু, প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্যে তিনি সত্যকে খুঁটিয়ে দেখতেন আর তার মূল কারণ আবিষ্কার করার চেষ্টা করতেন। বালক সক্রেটিস রাস্তায় চলতে চলতে যদি দেখতেন কোথাও ভিড় জমেছে বা রাস্তায় কোনো আকস্মিক ঘটনা ঘটেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ দৌড়ে সেখানে হাজির হতেন আর বিজ্ঞ দার্শনিকের মতো সেই সব ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে তার ভিতর থেকে সত্যকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করতেন। এক-একদিন আবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা কী যে চিন্তা করতেন কেউ ধারণা করতেও পারত না। লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত কতক্ষণে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয়। এক-একদিন সারাদিন-সারারাত কেটে যেত এইভাবে গভীর চিন্তা করতে করতে। এই সব নানা

গুণের জন্য তাঁর শিক্ষক প্রাডিক্স তাঁকে খুব ভালোবাসতেন।

সক্রেটিস এথেন্স ছেড়ে বাইরে কোথাও যাবার চিন্তা করতে পারতেন না। এথেন্স ছিল তাঁর সাধনার পীঠস্থান। খেলাধুলা, বাইরে বেড়াতে যাওয়া এই সবকে তিনি বাজে কাজ বলে মনে করতেন। এ সবের পিছনে সময় নষ্ট করা তাঁর পছন্দ ছিল না। তবে তিনি নিয়মিত শরীরচর্চা করতেন। এ জন্যে তিনি এক ব্যায়ামাগারে ভর্তিও হয়েছিলেন।

সক্রেটিস এথেন্সের মানুষকে আপন পরিবারের লোক মনে করে ভালোবাসতেন। কিসে তাঁদের মঙ্গল হবে এই ছিল তাঁর সর্বক্ষণের চিন্তা। এথেন্সের মানুষজনও তাঁকে আপন ঘরের ছেলে বলে ভালোবাসত। তাঁর

অনাড়ম্বর জীবন, সহজ চালচলন, গভীর বন্ধুপ্রীতি তাঁকে এথেন্সে বাল্যকাল থেকেই বিশেষভাবে পরিচিত করে তুলেছিল। সুখ ভোগের প্রতি কোনোরূপ লালসা তাঁর কোনোদিনই ছিল না। জীবনে তিনি ছিলেন একজন অনাসক্ত পুরুষ। তিনি ভাবতেন ঈশ্বর বুঝি তাঁকে কোনো মহৎ কাজের দায়িত্ব পালনের জন্যে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আর সেই মহৎ কাজ হল সত্যকে রক্ষা করা, আর মানুষের কল্যাণ করা। সক্রেটিসের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল সত্যকে জানা, সত্যকে রক্ষা করা, তথা নিজেকে জানা।

পরবর্তীকালে তিনি যখন খ্যাতির উচ্চশিখরে পৌঁছেছিলেন তখন নিজেই স্বীকার করেছেন—'আমি যখন বালক ছিলাম তখন প্রকৃতি কী, ঈশ্বর কী, কীভাবে সৃষ্টির ভাঙাগড়া চলে এইসব ভাবতে খুব ভালো লাগত। আর এই সবের জন্যে আমার বিদ্যালয় ছিল গোটা এথেন্স নগর, চলমান জীব-জগৎ ছিল আমার শিক্ষক।

মহান ব্যক্তিদের বাল্যকাল এইরকমই হয়।
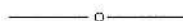
সত্যবাদী এবং পরদুঃখকাতর বালক নেপোলিয়ন

কোর্সিকার রাজধানী শহরের মাঝখানে এক বড় প্রাসাদ এবং তার সংলগ্ন এক বড় বাগান নানা ফল ও ফুলের গাছে ভরা। বাগানের মধ্যে দুটি ছেলেমেয়ে খেলা করছিল। ছেলেটি বড় তার নাম নেপোলিয়ন, মেয়েটি ছোট তার নাম ইলাইজা। ওরা দুই ভাইবোন খেলতে খেলতে বাগান থেকে বেরিয়ে শহরের রাস্তা ধরে অনেকদূর চলে গিয়েছিল। মালপত্র সাজিয়ে লোকেরা রাস্তার পাশে বেচাকেনা করছিল। ছেলেটি এবং মেয়েটি তাই দেখতে দেখতে আনমনে রাস্তা চলছিল। হঠাৎ ইলাইজার পায়ে লেগে এক বালিকার পাকা গোলাপজামের একটি ঝুড়ি উল্টে গেল। তার ফলে

গোলাপজামগুলি রাস্তায় পড়ে গেল এবং বেশির ভাগ ফল নষ্ট হয়ে গেল। তাই দেখে ফলওয়ালী মেয়েটি কাঁদতে আরম্ভ করল। নেপোলিয়ন একটু এগিয়ে গিয়েছিল। তার কান্না শুনে সে তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। ইলাইজা বলল— 'দাদা ! চল, আমরা পালিয়ে যাই, নইলে আমাদের কেউ চিনে ফেলবে।' নেপোলিয়ন উত্তর দেয়—'না, আমি যাব না। দেখতো, মেয়েটি কী রকম কাঁদছে। আমরা ওর যা ক্ষতি করেছি তা আমাদেরই পূরণ করে দেওয়া কর্তব্য।' দাদার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে ইলাইজা গোলাপজামগুলি একটি একটি করে কুড়িয়ে ঝুড়িতে রাখতে লাগল। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলছিল— 'সব জামগুলো থেঁতলে গেছে,

একটাও বিক্রি হবে না। বাড়ি গিয়ে মাকে কী বলব ? অথচ এই ফলগুলো বিক্রি করে আমাদের অন্তত তিন দিনের খাবার জোগাড় হত।' নেপোলিয়ন বলল—'কেঁদো না। এই নাও, বলে পকেট থেকে তিনটি টাকা বার করে মেয়েটির হাতে দিল।' আরো বলল— 'তুমি আমাদের সঙ্গে চল, বাড়িতে গিয়ে বাকি দাম দিয়ে দেব।' এই কথা শুনে ইলাইজা দাদার কানে ফিসফিস করে বলল—'এই দাদা ! একি করছিস ? মা এসব শুনলে আর রক্ষা থাকবে না। দেখিস, নির্ঘাৎ আমাদের শাস্তি দেবে।' নেপোলিয়ন উত্তর দিল—'তাতে কী হয়েছে ? আমরা এর ফলগুলো নষ্ট করে দিয়েছি, তার দাম তো আমাদেরই দিতে হবে। শুনলি না, এতে ওদের তিন দিনের খাবার জোগাড় হত ?'

এমন সময় বাজারে তাদের বাড়ির পরিচারিকার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ছেলেমেয়ে ফিরছে না দেখে নেপোলিয়নের মা দাসীকে তাদের খুঁজতে পাঠিয়েছিলেন। দুই ভাইবোনে তার কাছে যেতেই তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে দেখিয়ে দাসী জিজ্ঞাসা করল—'এ আবার কে ?' বালক নেপোলিয়ন উত্তর দিল —'আমরা এর একঝুড়ি গোলাপজাম নষ্ট করে ফেলেছি। মাকে বলে এর দাম দেওয়ার ব্যবস্থা করাব, তাই একে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

প্রাসাদের বৈঠকখানায় তাদের মা ম্যাডাম লিটিসিয়া তাঁর ভাই-এর সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন, এমন সময় বাড়ির পরিচারিকা দুই ভাইবোন, আর সেই কৃষক মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। ছেলেমেয়েদের দেখে ম্যাডাম লিটিসিয়া বলে উঠলেন— 'একি ? এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? তোমাদের খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছি। তোমাদের বাগানের বাইরে যেতে নিষেধ করেছি না ? এখন থেকে তোমরা বাড়ির বাইরে কোনো দিন খেলতে যাবে না।' 'মা ! ইলাইজাকে তুমি শাস্তি দিও না। আমিই ওকে ডেকে নিয়ে বাগানের বাইরে গিয়েছিলাম'—এই বলে নেপোলিয়ন সব দোষ নিজে স্বীকার করে নিল। ইলাইজা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। নেপোলিয়নের

মামা বালকের সত্যবাদিতায় খুব খুশি হলেন, আর লিটিসিয়াকে বললেন —'ওদের ক্ষমা করে দাও।' ইলাইজা সাহস পেয়ে মামার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল—'মামা ! আমার দোষেই ওই মেয়েটির ক্ষতি হয়েছে, দাদার কোনো দোষ নেই।'

মামা বললেন—'ইলাইজা ! কী হয়েছে সত্যি করে বলতো ?' ইলাইজা তখন আগাগোড়া সব কিছু বলে স্বীকার করল যে তার দোষেই ওই মেয়েটির ফলগুলি মাটিতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। নেপোলিয়ন মায়ের হাত দুটি ধরে বলল— 'মা ! একটা জিনিস চাইব, দেবে ?' মা বললেন—'কী জিনিস ?' নেপোলিয়ন বলল—'মা ! আমার হাত খরচের জন্যে যে টাকা তুমি আমাকে মাসে মাসে দাও তার থেকে অগ্রিম কিছু দেবে ? তাহলে এই মেয়েটির ফলগুলির দাম মিটিয়ে দেব।' মা খুব খুশি হয়ে তাঁর ব্যাগ থেকে টাকা বার করে তার হাতে দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন—'এখন থেকে কিন্তু দেড় মাস তুমি আর হাত খরচের টাকা কিছুই পাবে না, মনে থাকে যেন।' নেপোলিয়ন বলল— 'ঠিক আছে, তাই হবে।'

নেপোলিয়ন টাকাগুলি নিয়ে ফলওয়ালী মেয়েটির হাতে তুলে দিতেই মেয়েটির চোখ মুখ আনন্দে ভরে উঠল। পুরো দাম পেয়ে সে প্রথমে যে তিনটি টাকা পেয়েছিল, সেগুলি নেপোলিয়নকে ফিরিয়ে দিতে গেল। নেপোলিয়ন বলল—'না, তোমাকে ওটা ফেরত দিতে হবে না, তুমি সবটাই নাও।'

ম্যাডাম লিটিসিয়া কৃষক মেয়েটির সততা দেখে খুব খুশি হলেন এবং মেয়েটির পরিবারের সব খবর জিজ্ঞাসা করলেন। যখন শুনলেন তার মা অসুস্থ তখন তিনি সকলকে নিয়ে তাদের বাড়িতে গেলেন, এবং তার অসুস্থ মায়ের জন্য ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করে দিয়ে এলেন।

এই নেপোলিয়ন হচ্ছেন বিশ্ববিখ্যাত বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। আর তিনি ছিলেন পরদুঃখকাতর, কর্তব্যপরায়ণ এবং সত্যবাদী। যাঁরা এই রকম খ্যাতনামা পুরুষ হন বাল্যকাল থেকেই তারা নানা গুণসম্পন্ন হন।

———o———

বালক গোখলের সত্যবাদিতা

বড় মানুষদের ছেলেবেলাকার স্বভাব-চরিত্রের কথা শুনলেই বোঝা যায় কেন তাঁরা পরবর্তীকালে এত যশস্বী এবং কীর্তিমান হন। দেশভক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে এই রকম একজন মানুষ যাঁকে দেশবাসী 'মহামতি' আখ্যায় ভূষিত করেছিল। সত্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা সর্বজনবিদিত। এক কথায় তিনি ছিলেন সত্যের পূজারি। আর এই সত্যের সাধনা তাঁর বাল্যকাল থেকেই আরম্ভ হয়েছিল।

গোপালকৃষ্ণ তখন নয় কী দশ বৎসরের বালক, স্কুলে নিচু ক্লাসে পড়তেন। একদিন স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক ক্লাসের সব ছেলেদের কতকগুলি অঙ্ক বাড়ি থেকে করে আনতে বলেছিলেন। গোপালকৃষ্ণ সব অঙ্কগুলির মধ্যে একটি অঙ্ক করতে পারেননি। সেটি অন্য ছাত্রের খাতা থেকে লিখে নিয়েছিলেন। পরের দিন শিক্ষকমশায় সব ছেলেদের খাতা দেখার পর গোপালকৃষ্ণের খাতা দেখতে থাকেন। তিনি দেখলেন গোপালের খাতায় সব অঙ্কগুলিই সঠিক। অন্য ছেলেদের প্রত্যেকের কিছু না কিছু ভুল হয়েছে। কেউ কেউ একটি দুটি অঙ্ক করতেই পারেনি। গোপালের প্রত্যেকটি অঙ্ক ঠিক হয়েছে দেখে তিনি খুব খুশি হলেন এবং তাঁর খুব প্রশংসা করতে লাগলেন। তাঁর টেবিলে রাখা একটি বই নিয়ে গোপালকৃষ্ণকে বললেন— 'এই নাও, তুমি এত ভালো অঙ্ক করতে পার জেনে খুশি হয়ে এই বইটি তোমাকে পুরস্কার দিচ্ছি।'

গোপালকৃষ্ণ হাত গুটিয়ে নিলেন। তিনি বইটির দিকে হাত তো বাড়ালেন না, উল্টে মাথা নিচু করে কাঁদতে লাগলেন। শিক্ষকমশায় অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'একি ! তুমি কাঁদছ কেন ? নাও বইটা ধরো।' গোপালকৃষ্ণ হাতজোড় করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'স্যার ! আপনি মনে করেছেন এই অঙ্কগুলি সবই আমি করেছি, কিন্তু তা সত্যি নয়। পাঁচ নম্বর অঙ্কটি আমি করতে পারিনি তাই রমেশের খাতা দেখে আমার খাতায় টুকে

নিয়েছি। এখন বলুন, আমাকে পুরস্কার দেবেন ? না শাস্তি দেবেন ?'

এই কথা গোপালকৃষ্ণের মুখ থেকে শুনে শিক্ষকমশায় তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন এবং যারপরনাই খুশি হয়ে তাঁকে কোলে টেনে নিলেন আর তাঁর মাথায় গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন। তিনি বইখানি হাতে তুলে নিয়ে সব ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে গোপালকৃষ্ণের হাতে বইটি তুলে দিয়ে বললেন— 'এবার তোমাকে বইটি দিচ্ছি নাও। এ পুরস্কার তোমার সত্যবাদিতার জন্যে। তোমার মতো সত্যকথা বলার সাহস যেন প্রত্যেকটি ছাত্রের হয়।'

এই রকম আরো অনেক ঘটনা আছে যা গোপালকৃষ্ণের মহৎ জীবনের ভিত্তিস্বরূপ এবং আজও লোকের মুখে মুখে গল্পের মতো ঘোরে।

---o---
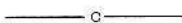
বালক রানাডের সততা

রানাডের পিতা কোল্লাপুরের বাসিন্দা ছিলেন। রানাডে সেখানেই লেখাপড়া শিখেছেন এবং বড় হয়েছেন। তিনি ছিলেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়ে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত এবং বোম্বাই-এর অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। বোম্বাই-এর প্রার্থনা সমাজ তাঁর দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। বহু বিদ্যালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। মারাঠা জাতির অভ্যুত্থান বিষয়ে তাঁর লেখা বই ইতিহাসের গবেষণার রসদবস্তু। পরবর্তীকালে তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই রানাডে ছিলেন মনেপ্রাণে সত্যনিষ্ঠ এবং ন্যায়বাদী ব্যক্তি। অন্যায় বা অসত্য তার কাছে কোনো দিন প্রশ্রয় পায়নি। বাল্যকালে তাঁর সততার বহু উদাহরণ আমাদের সেই রকমটি হতে উদ্বুদ্ধ করে। এই রকম উদাহরণের একটি গল্প নিম্নরূপ।

তখনকার দিনে মহারাষ্ট্রে এক প্রথা ছিল যে বৎসরের কোনো এক পূর্ণিমার দিন গৃহস্থের বাড়িতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত তথা বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে দুধ দ্বারা আপ্যায়ন করা হত, আর স্কুলের ছাত্রদের সেদিন ছুটি দেওয়া হত। ছাত্ররা সেদিন রাত্রিবেলা পাশা খেলবার অনুমতি পেত। একবছর হল কী, সেই নির্দিষ্ট পূর্ণিমার দিন তাঁদের বাড়িতে পাশা খেলার সঙ্গী কেউ আসেনি। হয়তো কোনো কারণে তারা অন্যত্র কারো সঙ্গে খেলতে গিয়েছিল। তাঁর বোন দুর্গাও সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছিল। রানাডে কী আর করেন, তখন একা একাই খেলবেন স্থির করে তাঁর পিসির কাছে রাখা পাশার ছকটি চাইতে গেলেন। পিসি বললেন—'দুর্গা

তো ঘুমিয়ে পড়েছে, অন্য কেউ তো আসেনি, তবে কার সঙ্গে খেলবি ?' 'সে আমি যার সঙ্গে হোক খেলব'—রানাডে উত্তর দিলেন। 'তুমি আমাকে ছকটা দাও তো।' রানাডের পিসি তাঁকে ছকটি দিলেন, আর রানাডে ছকটি নিয়ে দালানের বারান্দায় গিয়ে একটা থামের সামনে ছকটি পেতে বসে পড়লেন। একটি হাত নিজের পক্ষে আর একটি হাত থামের পক্ষে ভেবে নিয়ে খেলতে আরম্ভ করে দিলেন। কিন্তু পর পর দুবার তিনি থামের কাছে হেরে গেলেন। এই দেখে থামের আড়ালে লুকিয়ে থাকা তাঁর পিসি উপহাস করে হেসে উঠলেন, বললেন— 'একি রে ! ছিঃ ছিঃ, তুই নিষ্প্রাণ একটা থামের কাছে হেরে গেলি ? এ বদনাম তুই রাখবি কোথায় ?' তাই শুনে দশ

বছর বয়সের রানাডে উত্তর দিলেন—'তাতে কী হয়েছে ? যা ঠিক তা সর্বদাই ঠিক। থামটা জিতেছে আমি হেরেছি তাতে হাসবার কী আছে ? আর বদনামেরই বা কি আছে ? থামের হাতে ঠিক ঠিক দান পড়েছে তাই জিতেছে ; আমার হাতে দান ঠিক ঠিক পড়েনি, তাই আমি হেরেছি। অপমানের কী হয়েছে ? থামের হয়ে আমি ডান হাত দিয়ে খেলেছি। এই হাতটাই খেলায় অভ্যস্ত, তাই থামের দিকে ঠিক ঠিক দান পড়েছে ; আর বাঁ হাত দিয়ে আমার দান চেলেছি আর তাই আমার দান একবারও ঠিক পড়েনি। আমি চাইলেই কি দান আমার পক্ষে পড়বে ?'

অপর কোন চালাক ছেলে হলে থামের কাছে কিছুতেই হারতো না। একবার হেরে পরের চালেই হাত বদল করে ফেলতো। ছেলেবেলা থেকেই রানাডের এই রকম স্বভাব গড়ে উঠেছিল। তিনি কোনো অজুহাতেই কপটতা করতেন না। তাঁর কাছে যা সত্যি যা ন্যায্য বলে মনে হত তাই তিনি সকলের সামনে অকপটে স্বীকার করে নিতেন। তাঁর কাছে ন্যায় বিচার ছিল সব স্বার্থের ঊর্ধ্বে।

—o—
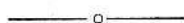
অল্পবয়সি ভিক্টোরিয়ার সত্যবাদিতা

ইংল্যান্ডেশ্বরী রানি ভিক্টোরিয়া বৃটেনের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন এডয়ার্ড—ইংল্যান্ডের রাজা, ডিউক অফ্ কেণ্ট নামে সুপরিচিত। মাতা হলেন স্যাকস্কোবার্গের ডিউক কন্যা, মেরিয়া লুইসা। রাজবংশে ভিক্টোরিয়া ছিলেন একমাত্র সন্তান। সুতরাং তিনিই যে ইংল্যান্ডের ভাবী রানি সে কথা সর্বজনবিদিত ছিল। অতএব সেইভাবে তাঁর মাতা-পিতা তাঁকে বাল্যকাল থেকেই উপযুক্ত ভাবে গড়ে তোলার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন ; যাতে তাঁদের কন্যা সর্বগুণসম্পন্না, বিদ্বান, বুদ্ধিমতী এবং সম্ভ্রমশালিনী হয়ে ওঠে। ভিক্টোরিয়াও নিজেকে সেইভাবেই প্রস্তুত করতে সচেষ্ট ছিলেন। মাতা-পিতার প্রতি তাঁর বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা ছিল

অপরিসীম। মায়ের কথার এতটুকু অবাধ্যতা তাঁর মধ্যে দেখা যেত না। সত্য কথা বলা, সৎ পথে চলা, সৎ আচরণ করা ইত্যাদি তাঁর অতি শৈশব কাল থেকেই অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

ভিক্টোরিয়া তাঁর মায়ের কাছ থেকে প্রতি সপ্তাহে হাত খরচের জন্য নির্দিষ্ট কিছু পয়সা পেতেন, আর সেই পয়সা জমা থাকত তাঁর গৃহশিক্ষিকার কাছে। সেই পয়সা দিয়ে নানা রকমের খেলনা, খাতা, পেন্সিল কিনে তিনি তাঁর সঙ্গীসাথীদের উপহার দিতেন।

ভিক্টোরিয়া তখন আট কী নয় বছরের বালিকা। একদিন গৃহশিক্ষিকার সঙ্গে বাজারে গিয়েছিলেন আর খেলনার দোকানে গিয়ে একটি ছোট্ট সুন্দর পেন্সিল রাখার বাক্স পছন্দ করেছিলেন। কিন্তু দাম দেবার সময় গৃহশিক্ষিকা দেখেন বাক্সটির যা দাম তা তাঁর কাছে নেই। তাই বললেন—'এ সপ্তাহের পয়সা সব শেষ হয়ে গেছে, কাজেই এখন এটা নেওয়া যাবে না।' দোকানদার জানত তার খরিদদার বালিকাটি কে ! তাই সে বলল—'তাতে কী! আপনি বাক্স নিয়ে যান, পয়সা পরে দিলেও চলবে।'

ভিক্টোরিয়া বললেন— 'আমি ধারে কোনো জিনিস নেব না। আপনি বরং বাক্সটা আলাদা করে সরিয়ে রেখে দিন, পরের সপ্তাহে এসে নিয়ে যাব।' এক সপ্তাহ পরে খরচের পয়সা পাবার পর তিনি বাক্সটি কিনে নিয়ে এলেন।

একদিন ভিক্টোরিয়ার পড়ায় মন লাগছিল না। শিক্ষিকা বললেন —'রাজকুমারী ! একটুখানি পড়ে নাও, তাহলে তাড়াতাড়ি ছুটি দিয়ে দেব।' ভিক্টোরিয়া বললেন — 'আজ আমি কিছুতেই পড়ব না।' 'আমার কথা শোনো'—শিক্ষিকা আবার অনুরোধ করলেন। কিন্তু বালিকার এক কথা– 'আমি আজ কিছুতেই পড়ব না।' এমন সময় তাঁর মা লুইসা তাদের কথা শুনতে পেয়ে দরজার পরদা সরিয়ে বেরিয়ে এলেন, আর মেয়েকে চোখ কটমট করে বললেন—'কী বকছিস কী ? পড়তে বস, কথার অবাধ্য হতে নেই।' শিক্ষিকা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন— 'ম্যাডাম ! আপনি কিছু মনে করবেন না। রাজকুমারী আজই একবার মাত্র আমার কথার অবাধ্য হয়েছে।'

বালিকা ভিক্টোরিয়া বলে উঠলেন—'সে কী ! আপনার মনে নেই, আমি আর একদিন আপনার কথা শুনিনি ? এই নিয়ে দুবার হল।' লুইসা হেসে ফেললেন।

বাল্যকাল থেকে এরূপ সত্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং সত্যভাষণের অভ্যাস এবং চরিত্রের যাবতীয় সদ্‌গুণ তাঁকে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী করেছিল। তাই পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডের রাজসিংহাসনে বসে মহারানি ভিক্টোরিয়া এত যশস্বিনী এবং প্রজা হিতৈষিণী হতে পেরেছিলেন।

হেলেন ওয়াকারের সত্যনিষ্ঠা

প্রায় দুশো বছর আগেকার কথা—স্কটল্যান্ডের এক গরিব পরিবারে হেলেন ওয়াকারের জন্ম হয়। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন অতিশয় সত্যনিষ্ঠ। সত্যরক্ষার জন্য যে কোনো কষ্ট স্বীকার করতে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। তাঁর মতে সংসারের মিথ্যা বলার মতো আর পাপ নাই। সত্য এবং ন্যায় ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। সত্যনিষ্ঠার পরিচয় তাঁর জীবনের অজস্র ঘটনার মধ্যে পাওয়া যায়। একটি ঘটনার কথা বলি—হেলেনের থেকে কয়েক বছরের ছোট তাঁর এক বোন ছিল, যাকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন আর সর্বদা কাছে কাছে রাখতেন। তখনকার দিনে ব্রিটেনে এক কড়া সরকারি আইন বলবৎ ছিল যা অমান্য করলে যে কোনো আইন ভঙ্গকারী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড অনিবার্য ছিল। আর সেই আইনই হেলেনের ছোট বোনটি একদিন ভঙ্গ করে বসল। যদিও সে সরল বালিকামাত্র, না বুঝে অপরাধ করে ফেলেছিল, তা হলেও আইন তো তাকে ছাড়বে না। সুতরাং অপরাধ প্রমাণ হলে মৃত্যুদণ্ড তার হবেই। এই অপরাধের একমাত্র সাক্ষী ছিলেন তার দিদি হেলেন। তিনি যদি বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারতেন তাহলে তাঁর বোন মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেতে পারত। আর সে যে অপরাধ করেছে তা লোকে জানতেও পারত না।

সুতরাং হেলেনের সামনে এক কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হল। তাঁর জীবনের আদর্শ হল সত্যপালন। জীবন থাকতে তিনি মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারবেন না। বোনটির চরিত্র কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। সে নিজে প্রাণে বাঁচতে হেলেনকে বারবার মিথ্যা সাক্ষী দিতে প্ররোচিত করতে লাগল। কিন্তু শত যুক্তি শত অনুনয় বিনয়েও হেলেনকে টলানো গেল না। কিন্তু হেলেন মনে মনে যারপরনাই কষ্ট পেতে লাগলেন। বোন বলল—'দিদি ! তোর হৃদয় বলে

কিছু নেই। তুই একেবারে পাষাণ। আমি মরতে বসেছি আর তুই সত্য, ন্যায় এইসব কথা শোনাচ্ছিস ? তোর সামান্য মিথ্যা বলায় আমার প্রাণ রক্ষা পায়, আর তুই তোর সত্য আঁকড়ে বসে থাকবি ?' হেলেন তাতেও অনড়, তিনি ভাঙবেন তবু মচকাবেন না।

হেলেন চিন্তায় চিন্তায় পাগল হয়ে যেতে বসলেন। তাঁর কেবলই চিন্তা সত্যকেও রক্ষা করা যায় আবার বোনকেও মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচানো যায় এমন একটা পথ বার করতেই হবে। হঠাৎ তাঁর মাথায় এল, যদি তাঁর বোনের মৃত্যুদণ্ড হয়ও তাহলেও দেশের রাজা যদি এই দণ্ডাদেশ মুকুব করে দেন তবে তো তাঁর বোন প্রাণে বেঁচে যেতে পারে !' হেলেন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, তিনি যাবেন রাজার কাছে তাঁর বোনের প্রাণভিক্ষা করতে। কিন্তু সমস্যা হল তিনি যাবেন কী করে ? রাজা তো থাকেন সেই সুদূর লন্ডনে, স্কটল্যাণ্ড থেকে শত মাইল দূরে। হেলেন গরিবের মেয়ে, তাঁর পক্ষে এতদূর যাওয়া কী করে সম্ভব ? তখনকার দিনে রেলগাড়ি ছিল না, ছিল না কোনো নিরাপদ রাজপথ। ধনীরা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে রাজধানী লন্ডনে যাতায়াত করত। কিন্তু গরিব হেলেনের পক্ষে তা কী করে সম্ভব ? অদ্ভুত সমস্যা। তাঁকে তো পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। চিন্তায় হেলেনের চোখের ঘুম উড়ে গেল। একদিন সত্যই তাঁর সাক্ষীতে বোনের মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেল। হেলেন আদালত থেকে বাড়ি এসেই লন্ডন যাবার জন্যে পায়ে হেঁটেই বেরিয়ে পড়লেন। নিজের বোনকে বাঁচাবার জন্যে তিনি দিনের পর দিন রাতের পর রাত হাঁটতে লাগলেন। নিবিড় বন, কষ্টকর রাস্তা, সর্বোপরি কঠিন শীত। হেলেন ঈশ্বরের নাম জপ করতে করতে হাঁটতে হাঁটতে একদিন লন্ডনে গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁর নরম পায়ের তলায় বড় বড় ফোস্কা পড়ে গেল। সারা শরীরে ভীষণ যন্ত্রণা হতে লাগল, কিন্তু এসবকেই তিনি সত্য ও ন্যায়ের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে সয়ে নিলেন। হেলেন যেদিন লন্ডনে পৌঁছলেন, রানি সেদিন রাজধানীতে ছিলেন না। কবে ফিরবেন তারও কোনো ঠিক ছিল না। অতএব হেলেনকে রানি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু এই

কটা দিন তিনি কোথায় থাকবেন ? লন্ডনে হেলেনের পিতার এক জমিদার বন্ধু বাস করতেন। তিনি ছিলেন আরগিলের জমিদার, আদি বাসস্থান স্কটল্যান্ড। তিনি ঠিক করলেন বাবার বন্ধুর আশ্রয়ে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দেবেন। তিনি জমিদারের সঙ্গে দেখা করে বললেন—'আমি মহারানির সঙ্গে দেখা করতে চাই, তাই যে কটা দিন তিনি রাজধানীতে ফিরে না আসছেন সে কটা দিন আমি আপনার আশ্রয়ে থাকতে চাই। আপনাকে আর একটা অনুরোধ, দয়া করে যদি মহারানির সঙ্গে আমার দেখা করার একটা সুযোগ করে দেন তো খুব ভালো হয়।' কিন্তু জমিদারবাবু ওসবে রাজি হলেন না।

অগত্যা হেলেনকে আবার লণ্ডনের রাজপথে নামতে হল। হেলেন কিন্তু হতাশ হলেন না। তিনি ধৈর্য ধরে রাস্তার ধারে দোকানের বারান্দায় রাত কাটাতে লাগলেন। আর যে কটা পয়সা সঙ্গে এনেছিলেন তাই দিয়ে যৎসামান্য আহার করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে লাগলেন। রানি ফিরে এলে একদিন নিজেই সাহসে ভর করে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁর লন্ডন আসার কারণ সবিস্তারে মহারানির কাছে নিবেদন করলেন। সত্যের জয় সর্বত্র। মহারানি হেলেনের সব কথা বিশ্বাস করলেন এবং তাঁর সত্যনিষ্ঠা এবং রাজভক্তি দেখে খুব খুশি হলেন। তিনি হেলেনের বোনকে মৃত্যুদণ্ড থেকে ক্ষমা করে দিলেন। শুধু তাই নয়, লন্ডন থেকে স্কটল্যান্ড পর্যন্ত হেলেনের ফিরে যাওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থাও করে দিলেন।

হেলেন সত্যের উপর ভরসা করে তাঁর বোনকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

———o———

বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সততা

মালদা শহরের প্রান্তে একটি বড় আমবাগানে একটি তেরো চোদ্দো বছরের ছেলে আপনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেই সময় একজন দাড়িগোঁফওয়ালা লোক তার লটবহর নিয়ে বাগানে ঢুকে একটি আমগাছের নীচে বসল। লোকটি ছিল এক কাবুলিওয়ালা, নাম বশির মহম্মদ। সে একজন আখরোটের ব্যবসায়ী। অনেকটা পথ হেঁটে এসে একটু জিরুবে বলে সে বাগানের মধ্যে ঢুকেছিল। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে সে তার মালপত্র নিয়ে বাগান থেকে আবার বেরিয়ে গেল। কিন্তু অজান্তে তার টাকার থলিটি সেখানে পড়ে রইল। থলিতে ছিল পাঁচ হাজার টাকা। ছেলেটি ঘুরতে ঘুরতে এসে দেখে লোকটি যেখানে বসেছিল সেখানে একটি থলি পড়ে রয়েছে। সে থলিটি কুড়িয়ে নিয়ে দেখল তার মধ্যে অনেক টাকা রয়েছে। পিছন ফিরে দেখল লোকটি বাগান ছেড়ে চলে গেছে, তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। ছেলেটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল কীভাবে থলিটি লোকটিকে ফেরত

দেওয়া যায়। এমন সময় দেখা গেল লোকটি হন্তদন্ত হয়ে দৌড়তে দৌড়তে সেদিকেই ফিরে আসছে। বশির মহম্মদ বাগান থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গিয়েই টের পায় তার টাকার থলিটি ফেলে এসেছে। তাই দৌড়তে দৌড়তে পুনরায় বাগানের যেখানে সে বসেছিল সে দিকেই আসছিল। ছেলেটি বশীরকে বিব্রত দেখে জিজ্ঞাসা করল—'তোমার কি কিছু হারিয়েছে?' বশির মহম্মদ বলল—'হ্যাঁ খোকাবাবু! আমার টাকার থলিটি এখানে ওই গাছের তলায় ফেলে গেছি।' ছেলেটি তাকে থলিটি দেখিয়ে বলল—'এই থলি তোমার? এতে কত টাকা আছে?' বশির বলল—'হ্যাঁ বাবু! এই থলিটিই

আমার। ওতে পাঁচ হাজার টাকা আছে।' ছেলেটি নিশ্চিত হয়ে থলিটি বশিরকে ফিরিয়ে দিল আর বলল—'গুণে নাও, সবটাকা ঠিক ঠিক আছে কি না।' বশির মহম্মদ গুনে দেখল তার সব টাকাই ঠিক ঠিক আছে। সে ছেলেটিকে বলল—'তুমি এতগুলো টাকা পেয়ে ফিরিয়ে দিলে ? তোমার লোভ হল না ? এত টাকার লোভ সামলালে কী করে ?' ছেলেটি উত্তর দিল—'আমি ছেলেবেলা থেকে শিক্ষা পেয়েছি যে অপরের সম্পত্তি মাটির টুকরো মনে করে কোনো দিন তা আত্মস্যাৎ করতে নেই।' ছেলেটির কথা শুনে কাবুলিওয়ালাটি আশ্চর্য হয়ে চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সে অত্যন্ত খুশি হয়ে ছেলেটিকে পাঁচটি টাকা দিতে গেল। ছেলেটি বলল—'সে কী ? আপনার টাকা আপনাকে ফিরিয়ে দিয়েছি, এ তো আমার ধর্ম, এতে বকশিসের কথা আসছে কেন ? আপনার টাকা আপনাকে ফিরিয়ে না দিলে তো চুরি করা হত, বেঈমানি করা হত।'

ছেলেটির এই রকম সাধুতা দেখে বশির মহম্মদ তার খুব প্রশংসা করতে লাগল। পরে সে ছেলেটির এই সাধুতার কথা সংবাদপত্রে ছাপিয়ে দিয়েছিল, আর শেষে লিখেছিল যে—'এই টাকাটা ছিল আমার মালিকের। যদি ছেলেটি ওই টাকাটা ফেরত না দিত, তবে আমি মালিকের বিশ্বাস হারাতাম, আর আমাকে জেলে যেতে হত। এই ছেলেটি যে আমার কত বড় উপকার করেছে তা লিখে বোঝাতে পারব না। আমি এই ছেলের কথা কোনোদিন ভুলব না। প্রতিদিন আল্লার কাছে প্রার্থনা করব, হে প্রভু ! একে তুমি চিরজীবী করো, আর সুখে রেখ।'

ছেলেটির নাম বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়। সততার গুণে মানুষ সকলের আশীর্বাদ লাভ করে আর জনপ্রিয় হয়।

নির্দোষকে রক্ষাকারী এক সৎ বালক

কোনো এক বিদ্যালয়ে ক্লাসে শিক্ষকমশায় ঢুকলেই ছেলেরা এক সঙ্গে সিটি দিয়ে উঠত। এতে শিক্ষকমশায় যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হতেন এবং নিজেকে

খুব অপমানিত বোধ করতেন। একদিন এইরকম যেইমাত্র ছেলেরা সিটি দিয়ে উঠেছে অমনি শিক্ষকমশায়—'কে সিটি মারল রে ?' বলে রেগে গিয়ে যে ছেলেগুলিকে তাঁর সন্দেহ হল তাদের টেবিলের সামনে ডেকে এনে খুব ধমক দিলেন। ছেলেগুলি কেউই স্বীকার করল না যে কে সিটি দিয়েছে। শিক্ষকমশায় বললেন—'কাল থেকে ক্লাস আরম্ভ হওয়ার পর যে সিটি দেবে তাকে ক্লাস থেকে বার করে দেব আর তার গার্জেনকে চিঠি লিখব।' তারপর থেকে কয়েকদিন আর কেউ সিটি মারল না। কিন্তু কয়েকদিন পরেই আবার মাষ্টারমশায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন সিটি দিয়ে উঠল। ক্লাসের মধ্যে

একটি ছেলে ছিল খুব দুষ্ট। সকলেই জানত সে দুষ্টুমির রাজা। শিক্ষকমশায় ভাবলেন ওই ছেলেটিই তাহলে সিটি দিয়েছে, তাই তাকে টেবিলের সামনে ডেকে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—'আবার সিটি দিয়েছিস ?' জানিস এর কী শাস্তি। ছেলেটি কাঁদো কাঁদো হয়ে উত্তর দিল—'না স্যার, আমি আজ সিটি দিইনি, অন্য কেউ দিয়েছে।' শিক্ষকমশায় তার কথা বিশ্বাস করলেন না। বেত হাতে নিয়ে তাকে মারতে উদ্যত হলেন। এমন সময় পিছন থেকে একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল— 'স্যার, ও সিটি দেয়নি।' শিক্ষকমশায় বললেন— 'বল, তবে কে সিটি দিয়েছে ? আয়, এদিকে আয়।' ছেলেটি ভয়ে ভয়ে টেবিলের সামনে এগিয়ে এল, আর বলল— 'স্যার, আমি ভুল করে একাজ করে ফেলেছি। আমি চাইনি তবু আমার মুখ দিয়ে সিটি বেরিয়ে গেল। আপনি ওকে শাস্তি না দিয়ে আমাকে দিন।'

শিক্ষকমশায় তার কথা শুনে খুব খুশি। বললেন—'বাঃ ! তুমি তো খুব ভালো ছেলে ! সত্য কথা বলতে ভয় পাও না। তোমাকে শাস্তি দেব না। নিজে থেকে উঠে এসে তুমি যখন তোমার ভুল স্বীকার করেছ, আর বিনা দোষে একজন শাস্তি পাচ্ছিল তাকে রক্ষা করেছ তখন তোমার শাস্তি পাওয়া উচিত নয়। তোমার এই শুভ বুদ্ধিতে আমি খুব খুশি হয়েছি। সব ছেলেদেরই আমি বলছি—এর মতো সত্যবাদী হও। নিজের দোষ স্বীকার করবার সাহস রাখো, জীবনে উন্নতি করতে পারবে। লেখাপড়া শেখা সার্থক হবে। লোকে তোমাদের ভালোবাসবে।'

———o———

জর্জ ওয়াশিংটনের পরোপকারিতা এবং সত্যবাদিতা

এক পাহাড়ি নদীর ধারে সকালবেলায় একজন মহিলা 'বাঁচাও ! বাঁচাও ! আমার ছেলেকে বাঁচাও !' বলে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করছিল। তার পাঁচ-ছ বছরের ছেলেটি নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে গিয়েছিল। তাকে আর দেখা যাচ্ছিল না। মহিলার চিৎকারে লোকজন ছুটে সেখানে জড়ো হল, কিন্তু

কেউ সাহস করে নদীতে নামতে পারল না। সবাই তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নদীটার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। নদীর স্রোত ছিল ভীষণ প্রখর, তার উপর ভয় ছিল জলের তলায় পাথরের বড় বড় চাঙড়ে ধাক্কা লেগে হাড়গোড় ভেঙে যাবার। সেই সময় একটি আঠারো বছরের তরুণ সেখানে ছুটে এল আর ঝপাং করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জনতা একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। ছেলেটি জলে ডুব দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। বোঝা যাচ্ছিল সে বারবার স্রোতের ঘূর্ণিতে পড়ে যাচ্ছে। কয়েকবারই স্রোতে

এমন তলিয়ে যাচ্ছিল যে অনেকক্ষণ ধরে তাকে দেখাই যাচ্ছিল না। জলের তলায় পাথরে যে ঘা খাচ্ছিল না তাই বা কে বলবে। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষে ডুবন্ত অচেতন বালকটিকে সে খুঁজে পেল আর নিজের পিঠে চাপিয়ে সাঁতার দিতে দিতে নদীর কিনারায় এসে উঠল।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টার পর ছেলেটির জ্ঞান ফিরে এলে যুবকটি কাঁদতে থাকা সেই মায়ের কোলে তাকে তুলে দিল। মা ছেলেটিকে ফিরে পেয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে কাঁদতে লাগল, আর যুবকটিকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করতে থাকল।

জনতা একে একে সেখান থেকে সরে যেতে লাগল। যাবার সময় বলাবলি করতে করতে যাচ্ছিল—আচ্ছা সাহসী ছেলে বটে ! এ ছেলে একদিন সবারই মন জয় করবে, আর খুব নাম ডাক হবে।

অপরকে রক্ষা করার জন্যে নিজের প্রাণ বিপন্ন করা এই যুবকটির নাম জর্জ ওয়াশিংটন, পরবর্তীকালে ইনিই আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।

জর্জ আমেরিকার এক সম্ভ্রান্ত কৃষকের সন্তান। তিনি যখন ছোট ছিলেন তখন তাঁর বাবা তাঁকে একটি ছোট্ট কুঠার এনে দিয়েছিলেন। কুঠার হাতে নিয়ে জর্জ সারাদিন বাগানে খেলে বেড়াতেন। খেলতে খেলতে একদিন কী ইচ্ছা হল কুঠার দিয়ে গাছ কাটতে পারেন কিনা পরীক্ষা করে দেখবেন। বাগানে যে গাছই দেখছিলেন তাতেই কুঠারের কোপ মারছিলেন। তাঁর বাবা খুব দুষ্প্রাপ্য একটি চেরি ফলের চারা নিয়ে এসে অতি যত্নে বাগানে লাগিয়েছিলেন। বালক জর্জ সেটিও কুঠার দিয়ে কেটে ফেললেন। এইভাবে গাছ কাটা কাটা খেলা সাঙ্গ করে খুশিতে হাসতে হাসতে জর্জ বাড়ি ফিরলেন।

এদিকে জর্জের বাবা বাগানে গিয়ে দেখলেন তার সেই সাধের মূল্যবান চেরি ফলের গাছটি কে কেটে ফেলে রেখেছে। তিনি মালিদের প্রত্যেককে একে একে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু কেউ বলতে পারল না কে গাছটি কেটেছে। তিনি তখন মনের দুঃখে বাড়ি ফিরে এলেন, আর এসেই জর্জকে

জিজ্ঞাসা করলেন। জর্জ উত্তর দিলেন—'বাবা ! আমি কুঠার দিয়ে বাগানের গাছে কোপ মেরে দেখছিলাম যে গাছ কাটতে পারি কিনা। ওই গাছটাও আমি আমার কুঠার দিয়ে কেটে ফেলেছি।' জর্জের বাবা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বললেন—'বাছা ! তোমাকে বাগানে গাছ কাটার জন্যে কুঠার এনে দিইনি, ওটা শুধু তোমাকে খেলনা হিসেবে এনে দিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম ওটা নিয়ে তুমি বাগানের বাইরে খেলা করবে। যাইহোক, তুমি না বুঝে গাছটা কেটেছ। তুমি যে সত্যি কথাটা স্বীকার করেছ তার জন্যে আমি খুব খুশি। আর কোনোদিন বাগানে গিয়ে কোনো গাছে হাত দিও না।'

এইরকম নানা ঘটনা জর্জ ওয়াশিংটনের বাল্যকালে ঘটতে দেখা গেছে। তার সত্যবাদিতা, সাহসিকতা পরের দুঃখ মোচনের জন্যে নিজের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, এসব ছেলেবেলা থেকেই তাঁর চরিত্রগত হয়ে গিয়েছিল।

বালক চার্লির সততা

একদিন শহরের রাজপথে চার্লি নামে একটি বালক বল নিয়ে খেলতে খেলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ বলটি লাফিয়ে গিয়ে রাস্তার ধারে একটি দোকানে ঢুকে পড়ে। দোকানটি ছিল ওষুধের। বলটি গিয়ে সরাসরি একটি টেবিলে রাখা বড় কাঁচের বোতলের গায়ে লাগে, ফলে বোতলটি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। অন্য ছেলে হলে দৌড়ে পালিয়ে যেত, চার্লি কিন্তু পালাল না, কারণ সে ছিল সাহসী এবং সত্যবদী। সে লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি দোকানে উঠে গিয়ে দোকানের মালিককে বলল—'দেখুন ! আমার দোষেই বোতলটা ভেঙে গেল। আপনি কিছু মনে করবেন না। কি করতে হবে বলুন ? আপনি যা বলবেন তাই করব।' দোকানের মালিক বোতলটা ভেঙে গেছে দেখে ছেলেটিকে বলল—'বোতলটার যা দাম তাই দিয়ে যাও।' চার্লি গরিবের ছেলে, তার পক্ষে বোতলের দাম মেটানো সম্ভব ছিল না। সে বলল—'দেখুন আমার কাছে তো পয়সা নেই, আমি বরং আপনার দোকানে কাজ করে এর দাম শোধ করে দেব।' মালিক বলল—'বেশ ! ঠিক আছে !

তুমি আমার দোকানে কিছুদিন কাজ করো, তাহলেই দামটা শোধ হয়ে যাবে।' চার্লি ওই দোকানে কাজ করতে থাকল। চার্লির কাজ দেখে দোকানের মালিক মনে মনে তার প্রশংসা করতে লাগল। চার্লি নিজের দোকান ভেবে খুব যত্ন নিয়ে দোকানের প্রতিটি কাজ করছিল। বেশ কয়েকদিন কাজ করার পর বোতলের দামের সমপরিমাণ টাকা মাইনে হিসেবে পেয়ে সে মালিককে বলল—'আমার বেতন থেকে বোতলের দাম কেটে নিয়ে আমাকে তাহলে এবার ছেড়ে দিন।' দোকানের মালিক

বলল—'তুমি খুব বিশ্বাসী, আর পরিশ্রমী ছেলে। তুমি আমার দোকানে থাকলে আমার দোকান ভালো চলবে। তোমার মতো সৎ আর উদ্যমী ছেলে আমি খুঁজলেও কোথাও পাব না। আমার দোকানে একজন ম্যানেজারের দরকার। তোমাকে আমি দোকানে ম্যানেজার করে রাখতে চাই।' চার্লি রাজি হয়ে গেল। আর সেই দিন থেকেই ওই দোকানে ম্যানেজার হিসাবে বহাল হয়ে গেল। চার্লির ভবিষ্যৎ ভাবনা রইল না। তার আরামে দিন কাটতে লাগল।

সৎকাজের প্রথম দিকে একটু অসুবিধা হয় কিন্তু সেটাকে যে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে, পরিশেষে সে এর সুফল পায়। সততা, বিশ্বাস আর নিঃস্বার্থপরতা মানুষের উন্নতির সোপান।
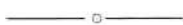
জনৈক সৎ বালকের মহিলাকে তার হারানো লকেট ফিরিয়ে দেওয়া

গরিবের ছেলে শত অভাবের মধ্যেও যে কত সৎ হতে পারে এ কাহিনী তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বালকটি একজন খালাসির ছেলে। বাবা, মা আর ছেলেটি—এই নিয়ে তাদের সংসার। তার বাবা কোনো এক জাহাজে খালাসির কাজ করত। তার একার রোজগারে ছোট্ট পরিবারটির কোনো রকমে সংসার চলে যেত। সে দু মাস এক মাস অন্তর বাড়ি ফিরত। ছেলেটি বলতে গেলে মায়ের কাছেই মানুষ। গরিব হওয়ার জন্যে তার মা তাকে লেখাপড়া শেখাতে পারেনি, কিন্তু সৎ উপদেশ দিয়ে মানুষ করেছিল। এমনি তার কপাল মন্দ যে, একদিন সংবাদ পেল তার বাবা জাহাজের ক্রেনে ধাক্কা খেয়ে মারা গেছে। বাবা মারা যাওয়াতে তারা বড় অসহায় হয়ে পড়ল। তার বাবা যেটুকু টাকা পাঠাত তাতেই তাদের নুনভাতটা কোনো রকম জুটে যেত। এখন কোনো উপায়ান্তর না দেখে ছেলেটি চিন্তা করল—'এবার তো আমাকেই রোজগার করে এনে

সংসার চালাতে হবে।' তাই সে রোজগারের পথ খুঁজতে লাগল। ছেলেটি ছিল মায়ের খুব বাধ্য আর মাকে ভীষণ ভক্তি করত। মায়ের অনুমতি নিয়ে সে চাকরির খোঁজে বার হল। একদিন ভাগ্যক্রমে একটা চাকরি জুটেও গেল। এও আবার সেই জাহাজে খালাসির কাজ। যাইহোক সে বাড়ি এসে মাকে বলল— 'মা ! আমি একটা জাহাজে খালাসির কাজ পেয়েছি, অমুক দিন আমাদের জাহাজ ছাড়বে। জাহাজ ফিরে এলে আমি ঘরে আসব।' মা বলল —'বাবা ! আবার সেই জাহাজের চাকরি ? ভালোভাবে থাকিস। ক্রেনের কাছে বেশি যাস না। আর একটা কথা, সবসময় সত্যি কথা বলবি, আর পরের জিনিসে লোভ করবি না। সকলের বিশ্বাসী হয়ে থাকবি।'

ছেলেটি মাকে প্রণাম করে জাহাজ ছাড়ার দিন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তাদের জাহাজ কত দেশ, কত বন্দর ঘুরতে ঘুরতে শেষে এক বড় শহরের বন্দরে গিয়ে বেশ কিছুদিনের জন্যে নোঙর করল।

জাহাজের ক্যাপটেন ছেলেটিকে খুব স্নেহ করত, আর সবার থেকে বেশি বিশ্বাসও করত। কারণ ছেলেটি ছিল খুব সৎ আর বিশ্বাসী। নিয়মিত ভগবানের প্রার্থনা করত, এজন্যে জাহাজের অন্যান্য খালাসিরাও তাকে খুব পছন্দ করত। একদিন কয়েকজন খালাসির সঙ্গে সে শহর দেখতে বেরুল। শহরের রাস্তায় যখন তারা হেঁটে যাচ্ছিল, তখন তাদের সামনে একটি গাড়ি এসে থামল। এক ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী গাড়ি থেকে নামলেন। নামবার সময় ভদ্রমহিলার গলা থেকে হিরের হারখানি গাড়ির নীচে পড়ে গেল, ভদ্রমহিলা জানতেও পারলেন না। ওই ছেলেটি কিন্তু দেখতে পেয়েছিল যে ভদ্রমহিলার গলা থেকে হারখানি পড়ে গেল। আর কেউ সেদিকে লক্ষ করেনি। ছেলেটি গাড়ির কাছে যাবার আগেই ভদ্রলোক এবং মহিলাটি একটি বড় হোটেলে ঢুকে পড়লেন। ছেলেটি গিয়ে হারটি কুড়িয়ে নিল, আর ভাবতে লাগল এ তো মূল্যবান হার, ভদ্রমহিলাকে কী করে ফিরিয়ে দেওয়া যায় ? হারের কথা যখন তার সঙ্গীরা শুনল তারা বলাবলি করতে লাগল—'এ তো হিরের হার ! এটা বেচলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে। আর তোর অভাব থাকবে না। চাকরি না করলেও চলবে।' ছেলেটি তাদের কথা শুনে বলল—'এটি তো অপরের হার। এটা নিলে তো আমি চোর হয়ে যাব।

চুরি করা মহাপাপ। মা বলেছে নিজের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় কিন্তু ভগবানের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। এটা যার হার আমি তাকে ফেরত দেব।' সঙ্গীরা তাকে বহুরকম বোঝাল কিন্তু সে কারো কথায় কান দিল না। যে হোটেলে ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা ঢুকেছিলেন তার সামনে হারটি নিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর তারা হোটেল থেকে বেরিয়ে এলে সে ভদ্রমহিলার হাতে হারখানি দিয়ে বলল— 'এই নিন, আপনার হার। গাড়ি থেকে নামার সময় নীচে পড়ে গিয়েছিল।' হারখানি পেয়ে ভদ্রমহিলা ভীষণ

খুশি হলেন। ছেলেটিকে ধন্যবাদ দিয়ে তার ব্যাগ থেকে এক হাজার টাকা বার করে তার হাতে গুঁজে দিলেন। ভদ্রলোকও খুব প্রশংসা করলেন। ছেলেগুলি জাহাজে ফিরে এলে জাহাজের ক্যাপটেন এবং অন্যান্যরা খবরটা শুনল। জাহাজের ক্যাপটেন ছেলেটিকে তো দু-হাতে তুলে নিয়ে নাচতে লাগল। সকলেই তার সততার প্রশংসা করতে লাগল।

সৎ এবং নির্লোভ ব্যক্তি সকলের কাছেই আদর পায়।

জনৈক চরিত্রবান বালকের সংস্পর্শে এসে চরিত্র সংশোধন

একটি পনেরো-যোলো বছরের ছেলে কোনো এক জাহাজে খালাসির কাজ করত। জাহাজের খালাসিরা সকলেই মদ খেত, শুধু ওই ছেলেটি খেত না। এজন্যে তাকে অনেক ঠাট্টা-টিটকিরি শুনতে হয়েছে। কিন্তু ছেলেটি ওসবে কিছু মনে করত না। ছেলেটি কাজকর্মে খুব চটপটে ছিল। এজন্যে জাহাজের ক্যাপটেন বা অন্যান্যরা প্রত্যেকেই তার প্রশংসা করত। সে মদ খায় না বলে যেমন তার সমবয়সিরা নানাভাবে তাকে ঠাট্টা করত, তেমনি বয়স্ক খালাসিরা তাকে খুব ভালোবাসত। একদিন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই জাহাজের মাল খালাস হয়ে যাবার পর ক্যাপটেন নিজে সকলকে ডেকে নিয়ে এক জায়গায় পানভোজনের আয়োজন করেছিল।

সকলের সামনেই মদের গেলাস, সকলেই মদ খাচ্ছিল, শুধু ওই ছেলেটি বাদে। ক্যাপটেন তাকে ডেকে এক গেলাস মদ নিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—'নে ! খেয়ে নে। একদিন খেলে তোর জাত যাবে না। গলায় ঢেলে নে, দেখ শরীরটা কেমন গরম হবে।' ছেলেটি মদের গেলাস সরিয়ে দিয়ে ক্যাপটেনকে বলল—'মাফ করবেন স্যার, আমি মদ ছুঁতে পারব না।' ক্যাপটেন ধমকে বলে উঠল—'কি ? তুই আমার কথাতেও মদ খাবি

না ? জানিস আমার হুকুম না মানলে তার ফল কী হবে ?' ছেলেটি বিনম্রভাবে হাত জোড় করে বলল—'আপনি আমাকে মদ ছুঁতে বলবেন না ; আমি কিছুতেই মদ খেতে পারব না।' ক্যাপটেন রেগে বলে উঠল— 'জানিস ! আমার হুকুম না মানলে হাজতে ভরে দেব ?' আরও বলল—'মদ না খেলে তোর পায়ে শিকল পরিয়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দেব।' ছেলেটি অঝোরে পুনরায় অনুরোধ করল—'সাহেব ! আপনার হুকুম আমি কোনোদিনই অমান্য করিনি, কিন্তু এই মদের ব্যাপারেই শুধু করতে হচ্ছে।

আমি মাকে কথা দিয়ে এসেছি জীবনে কোনো দিন মদ ছোঁব না। মদ খেয়ে খেয়েই আমার বাবা মারা গেছে। এজন্যে মা আমাকে মদ না খেতে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে।'

ছেলেটির এই রকম উত্তর শুনে ক্যাপটেন সহ অন্যান্য সকলে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। বয়স্ক যারা ছিল আনন্দে তাদের চোখে জল এসে গেল। ক্যাপটেনের চোখে কী এক শপথের চিহ্ন চিকচিক করে উঠল। আর বলল— 'তুই ঠিক বলেছিস। আমি তোর মনের জোর দেখে খুব খুশি হয়েছি। তোর মতো কেন যে সবাই হয় না ! এখন থেকে আমি চাই তোর মতো সবাই মদ ছেড়ে দিক। মদ যে বিষ একথা আমিও জানি, আর সকলেই জানে, তবু এই বদ অভ্যাস কেন যে ছাড়তে পারি না জানি না। আজ থেকে আমিও মদ ছেড়ে দিলাম।' এই বলে ক্যাপটেন তার কেবিন থেকে সমস্ত মদের বোতল বার করে একে একে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল।

একটি চরিত্রবান মাতৃভক্ত সৎ ছেলে কীভাবে একজনকে মদের নেশা ত্যাগ করাল—এ হচ্ছে তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

জনৈক দরিদ্র সৎ বালক

বিলেতে শীতকালে অত্যধিক ঠাণ্ডা পড়ে। রাস্তা-ঘাট-ঘর-বাড়ি সব বরফে ঢেকে যায়। অবস্থাপন্ন বড়লোকদের কোনো অসুবিধা হয় না, তারা ঘরের মধ্যে গরম জামাকাপড় পরে থাকে। রাস্তায় যখন বেরোয় তখন কোট প্যান্ট টুপি পরে বেরোয়। মুস্কিল হয় গরিব লোকদের। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ তো নেইই, তার উপর মাথা গোঁজার ঘর পর্যন্ত নেই। গরিব যারা তারা রাস্তার ধারে দোকানের বারান্দায় শুয়ে রাত কাটায়। ওখানে বাড়ির ভাড়া খুব বেশি বলে তাদের পক্ষে বাড়ি ভাড়া করে থাকা সম্ভব হয় না। কারণ তারা অধিকাংশ গৃহস্থের বাড়িতে দিনমজুর খাটে, হোটেলে থালাবাসন ধোয়, কেউ কেউ বড়লোকদের গাড়ি ধোয়ামোছার কাজ করে। গরিবের

ছেলেমেয়েরা রাস্তায় রাস্তায় দেশলাই, রুমাল, মোজা, টুপি প্রভৃতি ছোট ছোট জিনিস ফেরি করে জীবিকা নির্বাহ করে।

একদিন এই রকম একটি গরিব ছেলে দেশলাই-এর বাক্স নিয়ে একটি হোটেলের গেটে দাঁড়িয়েছিল। ছেঁড়া প্যান্ট, খালি পায়ে ছেলেটি শীতে থরথর করে কাঁপছিল। সেই সময় দুজন লোক হোটেলের সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ছেলেটি তাদের কাছে গিয়ে বলল— 'স্যার ! দেশলাই নেবেন ?' তারা কোনো উত্তর দিল না। ছেলেটি আবার বলল— 'স্যার ! দাম বেশি নয়, মাত্র এক পেনি।' ওদের মধ্যে একজন লোক উত্তর দিল– 'না, আমার দেশলাই দরকার নেই।' ছেলেটি অপরজনকে জিজ্ঞাসা করল— 'স্যার, এক পেনিতে দুটো দেশলাই দেব, নিন।' তখন লোকটি বলল— 'দেখি, দে।' এই বলে পকেটে হাত দিল। পকেটে পেনি না পেয়ে বলল—'না রে, আজ নেওয়া যাবে না। খুচরো পেনি নেই। কাল নেব।' ছেলেটি বলল—'আজই নিন না স্যার। আজ আমার কাছে খাবার কিছু নেই। দিন, আমি পয়সা ভাঙিয়ে এনে দিচ্ছি।' তখন লোকটি তার হাতে একটি শিলিং বার করে দিল আর বলল—'তাড়াতাড়ি আসিস'। ছেলেটি শিলিং ভাঙাতে গিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফিরল না দেখে লোকটি ভাবল ছেলেটি বোধ হয় শিলিং নিয়ে পালিয়ে গেছে। তখন সে আপন মনে গজগজ করতে করতে বাড়ি চলে গেল।

পরের দিন সেই লোকটি ওই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় এদিক-সেদিক তাকাতে তাকাতে যাচ্ছিল, যদি ছেলেটাকে একবার দেখতে পায়। আর তখনই একটি ছোট ছেলে সেখানে এসে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল—'কাল কি আপনি আমার দাদার কাছে দেশলাই কিনেছিলেন ?' লোকটি বলল—হ্যাঁ, সে কোথায় ?' ছেলেটি বলল— 'কাল আপনার কাছে শিলিং নিয়ে ও সেটি রাস্তার ওপারে ভাঙাতে গিয়েছিল। ফেরার সময় গাড়ির ধাক্কায় রাস্তার ধারে ছিটকে পড়ে খুব জখম হয়েছে। দেশলাই-এর বাক্স, আপনার সাতটি পেনি দুর্ঘটনায় খোয়া গেছে। তার মধ্যে মাত্র চারটি পেনি খুঁজে

পেয়েছি। এই নিন সেগুলি।' রাস্তার লোকজন তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। খবর পেয়ে তার কাছে গিয়েছিলাম। আপনার পয়সার কথা তার কাছেই শুনলাম। খোঁজ করে ও আপনাকে পয়সাগুলি যেটুকু পাওয়া গেছে দিতে বলেছে।' লোকটি জিজ্ঞাসা করল—'তুমি খেয়েছ ?' সে উত্তর দিল —'না'। তখন লোকটি তাকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াল আর তাকে সঙ্গে নিয়ে তার দাদাকে দেখতে হাসপাতালে গেল। সেই ছেলেটি হাসপাতালে একটি খাটে শুয়ে ছিল। লোকটি কাছে যেতেই তাকে চিনতে পেরে বলল— 'কাল রাত্রে শিলিং ভাঙিয়ে যখন আসছিলাম তখন একটা

গাড়ি পিছন থেকে আমাকে ধাক্কা মারে আর তাতেই আমি পড়ে যাই। আপনার খুচরো পয়সাগুলিও ছিটকে পড়ে যায়। তার মধ্যে যেগুলি বেঁচেছে সেগুলি আমার ভাইকে আপনার কাছে পৌঁছে দিতে বলেছি, পেয়েছেন ?' এই কথাগুলি বলে সে তার ভাই-এর দিকে চেয়ে বলল—'ভাই ! আমি আর বাঁচব না। আমার ভিতরে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু তোকে কে দেখবে ? মা-বাবা মারা যাবার পর যতটুকু পেরেছি খেটেখুটে এনে তোকে খাইয়ে বড় করেছি। এখন ভগবান ভরসা। তিনিই তোকে এখন থেকে দেখবেন।' এইকথা বলতে বলতে ছেলেটি কেঁদে ফেলল। এই কথাগুলি শুনে লোকটি বলল—'আমি ওকে দেখব। ওর খাওয়া-পরার ভার আমি নিলাম।' মরণাপন্ন ছেলেটি খুশি হল। পরক্ষণেই কপালে হাত ঠেকিয়ে ঈশ্বরের কাছে করুণা ভিক্ষা করতে করতে চিরদিনের মতো সে চোখ বুজল।

সত্যবাদী আব্দুল কাদির

ইরান দেশের জিলান নামক এক গ্রামে আব্দুল কাদিরের জন্ম। আব্দুলের যখন পাঁচ-ছ বছর বয়স তখন তার বাবা মারা যায়। বাবাকে হারিয়ে সে মায়ের কাছেই মানুষ হয়। পড়াশুনায় সে খুব মনোযোগী ছিল। পড়াশুনায় খুব আগ্রহ দেখে মা তাকে গ্রামেরই এক স্কুলে ভর্তি করে দেন। লেখাপড়ার দিকে আব্দুলের অনুরাগ ক্রমশ বাড়তে থাকে। তাই গ্রামের স্কুলে পড়া শেষ হয়ে গেলে তার উচ্চশিক্ষা লাভের সমস্যা দেখা দিল। তখনকার দিনে উচ্চশিক্ষা নিতে হলে কোনো বড় শহরে যেতে হত। ছেলেকে উচ্চশিক্ষার জন্য শহরে পাঠানোর খরচ জোগাড় করা তার মায়ের পক্ষে অসম্ভব ছিল। আব্দুলের দূরসম্পর্কের এক কাকা বাগদাদে থাকতেন। তার মা তাঁকে চিঠি দিয়ে সব কথা জানালেন। তিনি উত্তর দিলেন যদি কাদিরকে কোনোভাবে বাগদাদে পাঠিয়ে দিতে পারেন তাহলে সেখানে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কাদির বাগদাদে যেতে মনস্থ করল। বাগদাদ ছিল তখনকার দিনে উচ্চ

শিক্ষার কেন্দ্র। কিন্তু তার মা কীভাবে তাকে বাগদাদ পাঠাবেন, সে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। এ কাহিনী অন্তত নশো বছর আগেকার। সে সময় না ছিল রেলগাড়ি না ছিল মোটরগাড়ি। বণিকের দল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে উট কিংবা খচ্চরের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাতায়াত করত। তারা দলবেঁধে মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করত, কারণ রাস্তায় চোর ডাকাতের খুব ভয় ছিল। সাধারণ যাত্রীরা এইসব বণিকদের দলের সঙ্গে যাতায়াত করত। জিলান থেকে একদল বণিক তখন বাগদাদ যাবার তোড়জোড় করছিল। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাদিরকে বাগদাদে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল। কাদিরের মা তাঁর একমাত্র ছেলেকে অন্যত্র পাঠাতে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন, কিন্তু ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তাকে আর না করতে পারলেন না। যাবার সময়ে তিনি চল্লিশটি আশরফি (আরবি মুদ্রা) কাদিরের হাতে দিয়ে বললেন— 'পুত্র ! এই কটি টাকা তোর বাবা রেখে গেছেন। খুব সাবধানে এগুলি খরচ করিস। আর একটা কথা সর্বদা মনে রাখবি—যত বড় বিপদই আসুক না কেন আল্লার উপর বিশ্বাস রাখবি, ভুল করেও যেন মিথ্যা কথা বলিস না। তোর মনস্কামনা পূর্ণ হবে, আল্লা তোর সহায়।'

মাকে প্রণাম করে আব্দুল কাদির বণিক দলের সঙ্গে বাগদাদ যাত্রা করল। রাস্তার মাঝে একদল ডাকাত বণিকদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরল এবং যা কিছু তাদের সঙ্গে ছিল লুটপাট করে নিল। ডাকাতরা ছিল সংখ্যায় বেশি, সে জন্যে বণিকরা তাদের বাধা দিতে পারল না। ডাকাতরা তাদের বেদম মারধরও করল। আব্দুলের জামাকাপড়ের অবস্থা দেখে আর তাকে ছেলেমানুষ ভেবে তার দিকে তারা নজর দিল না। ডাকাতি করে যখন তারা চলে যাচ্ছিল, তখন তাদের মধ্যে একজন আব্দুল কাদিরকে জিজ্ঞাসা করল—'এই ছেলে ! তোর কাছে কিছু আছে ?' আব্দুলের তার মায়ের কথা মনে পড়ল। সে বিনা দ্বিধায় বলে ফেলল—'হ্যাঁ, আমার কাছে চল্লিশটা আশরফি আছে।' ডাকাতরা ভাবল ছোকরা তামাসা করছে, তাই তাকে আচ্ছা করে ধমকে উঠল। আব্দুল যখন সত্যি সত্যি আশরফিগুলো বার করে দেখাল, তখন ডাকাতরা একেবারে 'থ' হয়ে গেল। ওদের যে সর্দার ছিল সে

এগিয়ে এসে কাদেরকে বলল—'এই ছেলে! তুই জানিস তোর টাকাগুলো আমরা কেড়ে নেব। তুই কেন বললি তোর কাছে আশরফি আছে ?'

আব্দুল বলল—'আমার মা আমাকে মিথ্যা কথা বলতে বারণ করেছে। আশরফিগুলো রক্ষার জন্যে আমি কেন মিথ্যা বলব ? তোমরা আমার আশরফিগুলো নিয়ে নাও, ভগবান আমার সহায়। তিনি আমার কাজের ক্ষতি হতে দেবেন না।'

একটা ছোট্ট ছেলের কাছে এ রকম পরম বিশ্বাসের কথা শুনে সর্দারের

মনে পরিবর্তন দেখা দিল। লুটপাটের উপর তার ঘৃণা জন্মাল। সে আব্দুল কাদিরের পিঠ চাপড়ে তাকে আশরফিগুলো পকেটে ভরে নিতে বলল। এরপর সে ডাকাতদের সবাইকে ডেকে বলল—'তোমরা বণিকদের সব মালপত্র টাকাকড়ি ফেরত দিয়ে দাও। আজ থেকে আমরা আর ডাকাতি, খুন, জখম করব না। এতটুকু ছেলের যখন ভগবানের উপর এত বিশ্বাস, তখন ভগবান আমাদেরও দয়া করবেন। তিনি দুনিয়ার মালিক, তাঁকে ভুলে আমরা একি পাপ কাজ করছিলাম ?' এই বলে সর্দার আর একবার কাদিরকে কোলে টেনে নিয়ে তার মাথায় চুমু খেয়ে বলল—'সাবাস বেটা ! তুই আজ আমাদের বেহেস্তের (স্বর্গের) পথ দেখালি। চলি !' বলে তারা দল বেঁধে সে স্থান ত্যাগ করল।

একটি ছোট্ট ছেলে শুধু সত্যের উপর ভরসা করে একটা ডাকাতদলকে পাপ কাজ থেকে বিরত করে নতুন পথের সন্ধান দিল।

এক ভিক্ষুক বালকের সততা

একদিন এক ধনী ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তখন একটি ছেঁড়া জামা-কাপড় পরা এক গরিব ছেলে তার কাছে গিয়ে সামান্য ভিক্ষা চাইল। ধনী ব্যক্তিটি তার হাতে পয়সা দিয়ে বলল—'এই নে, এর থেকে আমাকে তিন আনা ফেরত দিয়ে এক আনা নে।' ছেলেটি বলল—'আপনি এখানে একটু দাঁড়ান, আমি এক্ষুনি সিকিটা ভাঙিয়ে নিয়ে আপনাকে বাকিটা এনে দিচ্ছি।' এই বলে ছেলেটি দৌড়ে সিকিটি ভাঙাতে গেল। এ দোকান ও দোকান করে সিকিটি ভাঙাতে তার একটু দেরি হয়ে গেল। তার আসতে দেরি দেখে ভদ্রলোক সামান্য অপেক্ষা করে ভাবল ছেলেটি বুঝি সিকিটি নিয়ে পালিয়েছে তাই বিরক্ত হয়ে ছেলেটিকে মনে মনে গালাগালি করতে করতে সেখান থেকে সে চলে গেল। ছেলেটি কিছুক্ষণ পরেই সিকিটি ভাঙিয়ে নিয়ে সেখানে ফিরে এল, কিন্তু ফিরে এসে ভদ্রলোককে দেখতে পেল না।

ছেলেটি ভাবতে লাগল কী করে ভদ্রলোককে পয়সাটা ফেরত দেওয়া যায়। তার মাথায় এল যে সে তো রোজই এইখানে ভিক্ষা করে, সুতরাং যদি কোনো দিন ভদ্রলোককে দেখতে পায় তবে তাকে তিন আনা পয়সা ফেরত দিয়ে দেবে। এই ভেবে তিন আনা পয়সা সে আলাদা করে রুমালে বেঁধে রেখে দিল।

ছেলেটি প্রতিদিন ভিক্ষা করে দিন চালায়, কিন্তু ওই পয়সাটি সে কোনো দিন খরচ করেনি। কয়েক সপ্তাহ পরে সেই ভদ্রলোককে আবার ওই রাস্তায় দেখতে পেয়ে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে বলল— 'আপনার সেই তিন আনা
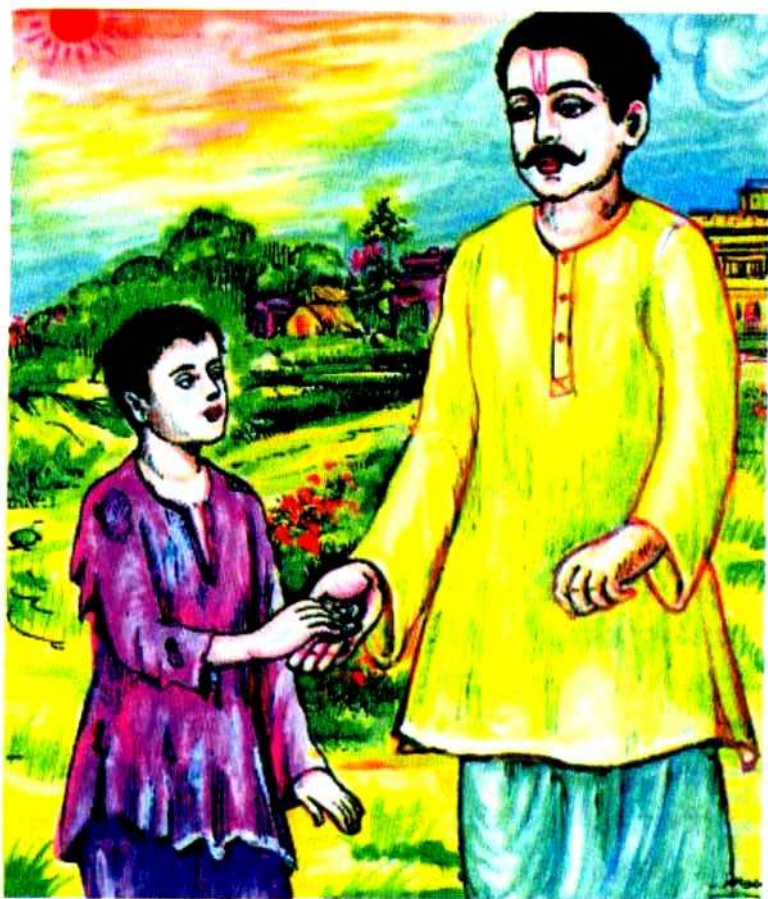
পয়সা সেদিন ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি, এই নিন।' ভদ্রলোক ছেলেটির সততা দেখে অবাক। ভদ্রলোকের পয়সাটার কথা মনেই ছিল না। প্রথম প্রথম দুই একদিন খোঁজ করেছিল তারপর ভুলে গিয়েছিল। ছেলেটির সততা দেখে সে খুব খুশি হল। তার দিকে চেয়ে আর তার দৈন্যদশা দেখে ভদ্রলোকের খুব দয়া হল, বলল—'তুমি আমার বাড়ি চলো। তোমাকে জামাকাপড় কিনে দেব। তোমাকে ভিক্ষা করতে হবে না, আমার ঘরেই থাকবে।' এই বলে সে ছেলেটিকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল এবং নতুন জামাকাপড় কিনে দিয়ে পরের দিনই স্কুলে ভর্তি করে দিল। বলল—'তুমি লেখাপড়া শেখো, ভবিষ্যতে তোমাকে আর খাবারের ভাবনা করতে হবে না।'

তারপর সেই ছেলে লেখাপড়া শিখে অত্যন্ত বিদ্বান হয়ে উঠল। তার সততার জন্যেই সে সুখি হল।

নির্লোভ বালক

একদিন একটি বাচ্চাছেলে খেলতে খেলতে পাড়ার এক ভদ্রলোকের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। বাড়িতে তখন কেউই ছিল না। ছেলেটি চারদিকে চেয়ে দেখল কেউই নেই, অথচ ঘরের দাওয়ায় এক ঝুড়ি সুন্দর সুন্দর পাকা আপেল নামানো রয়েছে। ছেলেটি মনে মনে ভাবল কেউ তো বাড়িতে নেই, এই সময় একটা আপেল নিয়ে পালালে হয়। পরক্ষণেই সে চিন্তা করল—'না বলে পরের জিনিসে হাত দেওয়া উচিত নয়। সে আপেলগুলির দিকে চেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। প্রতিবেশী ভদ্রলোক কিছুক্ষণ পর ঘরে ঢুকল আর দেখতে পেল ছেলেটি চুপচাপ উঠানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভদ্রলোক ছেলেটির কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল—'কী করছ ? তুমি আপেল ভালোবাস, খাবে ?' ছেলেটি উত্তর দিল—'হ্যাঁ, আমার আপেল খেতে খুব ভালো লাগে।' প্রতিবেশী ভদ্রলোক বলল—'তুমি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ ; বাড়িতে আমি ছিলাম না, তাহলে তুমি দু-একটা আপেল লুকিয়ে নিয়ে চলে গেলে না কেন ?' ছেলেটি উত্তর দিল—'আর কেউ দেখুক আর নাই দেখুক, আমি তো

দেখতাম। আমি নিজেকে কোনো অসৎ কাজ করতে দেখতে চাই না।' ছেলেটির কথা শুনে ভদ্রলোক যারপরনাই খুশি হল, আর তার হাতে ঝুড়ি থেকে ভালো ভালো কয়েকটা আপেল দিয়ে বলল—'তুমি খুব ভালো ছেলে, এমন ছেলে দেখা যায় না। আর শোনো, জেনে রেখো ভগবান সব জায়গাতেই আছেন আর আমাদের ভালো কাজ, মন্দ কাজ সবই তিনি দেখছেন। ঈশ্বরের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিছু করা যায় না। তাই আমাদের কোনো মন্দ কাজ করা উচিত নয়।

একটি রাখাল ছেলের সত্যনিষ্ঠা

কোনো এক গ্রামে একদিন এক রাখাল ছেলে জঙ্গলে ছাগল চরাচ্ছিল, এমন সময় সে তার পিছনে দেখল সুন্দর পোশাক পরা একটি দশ-বারো বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। রাখাল ভাবল ও হয়তো এই মাঠের মালিকের ছেলে। তাই তাকে নমস্কার করে বলল— 'বাবুসাহেব ! কিছু বলবেন ?' দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল — 'এই জঙ্গলে কি পাখির বাসা আছে ?' রাখাল ছেলেটি একটু চমকে উত্তর দিল—'হ্যাঁ, ও রকম অনেক বাসা আছে। আপনি জমিদারের ছেলে অথচ জানেন না ?' ছেলেটি বলল —'আমাকে পাখির বাসা দেখাবে ?' রাখাল ছেলেটি বলল—'আমি আজই একটা সুন্দর পাখির বাসা দেখে এসেছি, কিন্তু আপনাকে তা দেখাতে পারব না।' সেই সময় ছেলেটির মাস্টারমশায় সেখানে এসে দাঁড়াল। রাখাল ছেলেটির উত্তর শুনে শিক্ষকমশায় একটু রুষ্ট হয়ে তাকে বলল—'তুই তো আচ্ছা মূর্খ ছেলে। ও জমিদারের ছেলে, জঙ্গলে কখনো আসেনি, আর পাখির বাসাও দেখেনি। তাই ইচ্ছা হয়েছে পাখির বাসা দেখবে। তুই ওকে একবার বাসাটা দেখিয়ে দে না। ও পাখির বাসায় হাতও দেবে না।'

রাখাল ছেলেটি খুব বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিল—'দুঃখ কী জানেন ? আমি ওটা দেখাতে পারব না।' উত্তর শুনে শিক্ষকমশায় বলল— 'এই ছোকরা ! তোকে অনেককে অনেক রকমভাবে খুশি করতে হয়, তবে একে বাসাটা দেখিয়ে খুশি করছিস না কেন ?' রাখাল ছেলেটি মাথা নিচু করে বলল —''দেখুন ! ইনি জমিদারের ছেলে, একে দেখে আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করছি ; কিন্তু কিছু মনে করবেন না, যদি জমিদারও আসেন তাহলেও বাসাটা তাঁকে আমি দেখাতে পারব না। আমার বন্ধু বাবলু ওই দূরে টিলাটার উপর ছাগল চরাচ্ছে। ও আজই সকালে আমাকে পাখির বাসাটা দেখিয়েছে। আর বলেছে 'এই বাসাটা কাউকে দেখাস না, আমার দরকার আছে।' আমি কথা দিয়েছি কাউকে দেখাব না। কাজেই বাসাটা দেখালে আমার কথার

খেলাপ হয়ে যাবে।'' ওর উত্তর শুনে শিক্ষকমশায় পরীক্ষা করার জন্য গিনিভরা একটা থলি পকেট থেকে বার করে তাকে বলল—'যদি তুই পাখির বাসাটা একবার একে দেখাস, তাহলে এই গিনির থলিটা পুরোই তোকে দিয়ে দেব, বাবলুকে তুই কথাটা বলিস না।'

রাখাল উত্তর দিল—'বাবলু জানুক বা না জানুক, তাহলে আমার তো তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। আমি এ কাজ কোনোক্রমেই করতে পারব না।' কথা শুনে শিক্ষকমশায় বললেন—'এই গিনিগুলোর দাম জানিস ? তোর সারাজীবন এইগুলো দিয়ে চলে যাবে। ছাগল চরিয়ে আর তোকে খেতে হবে না।' রাখালটি বলল—'বাবুমশায় ! আমি জানি এগুলি পেলে আমার বাবা-মায়ের দারিদ্র্য ঘুচে যাবে কিন্তু তাহলেও আমি এ কাজ করতে পারব না। দয়া করে আমাকে লোভ দেখাবেন না। আপনারা এখান থেকে চলে যান।' মাস্টারমশায় পুনরায় বলল— 'ঠিক আছে, তুই বাবলুর কাছে গিয়ে তার সম্মতি নিয়ে আয়, তাহলে তোকে এই গিনিগুলো দেব, তার সঙ্গে আরও কিছু তোর বন্ধুকেও দেব।' রাখাল ছেলেটি বলল— 'ঠিক আছে, আজ দুপুরে জিজ্ঞাসা করে আসব।'

কথা শুনে শিক্ষকমশায় এবং জমিদারের ছেলেটি তখনকার মতো সেখান থেকে চলে গেল। তারা খোঁজ খবর নিয়ে জানল ছেলেটির নাম গোপাল। দুপুরের পর বাবলুকে সঙ্গে নিয়ে ছেলেটি মাস্টারমশায় এবং জমিদারের ছেলেকে খোঁজ করে তাদের সঙ্গে দেখা করে বলল— 'এই দেখুন, এই হচ্ছে আমার বন্ধু বাবলু। ও রাজি হয়েছে, চলুন পাখির বাসাটা আপনাদের দেখিয়ে আনি।'

তারপর তারা জমিদারের ছেলেকে বাসাটার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল —'ওই দেখুন, ওই যে একটা পাখি বসে রয়েছে, আর তার তলায় কতকগুলো ডিম রয়েছে, ওইটাই পাখিটার বাসা। ও এখন ডিমে 'তা' দিচ্ছে।' বাসার কাছাকাছি মানুষের শব্দ পেয়ে পাখিটা উড়ে গিয়ে অন্য একটা গাছের ডালে বসল। তখন পাখির বাসাটা বেশ ভালোভাবে দেখা

গেল। সুন্দর বুনন করা বাসাটা আর তাতে চার-পাঁচটা সাদাসাদা ডিম দেখে তো জমিদারের ছেলে খুব খুশি হল। শিক্ষকমশায়ও তার কথামতো গিনির থলিটি গোপালের হাতে দিল আর থলি ভর্তি গিনি পেয়ে ওরা আনন্দ করতে করতে বাড়ি চলে গেল।

সেদিনই জমিদারমশায়ও এদিক-সেদিক ঘুরতে ঘুরতে ছেলের খোঁজে সেখানে এসে হাজির হলেন। তারপর ওখানেই তারা সকলে মিলে জলখাবার খেতে বসলেন। জলখাবার খেতে খেতে ছেলেটি সুন্দর একটা

পাখির বাসার কথা, গোপাল এবং বাবলুর কথা—সব একে একে গল্প করল। রাখাল ছেলেটির সততার কথা সে তার বাবাকে বার বার বলতে লাগল। জমিদারমশায় এসব শুনে খুব খুশি হলেন, আর ছেলেটিকে ডেকে আনতে বললেন। ছেলেটি এলে তিনি আদর করে কাছে বসালেন আর বললেন—'বাছা ! তোমার সততার কথা সব শুনলাম। খুব ভালো। এমন বিশ্বাসী ছেলে দেখা যায় না। তুমি লেখাপড়া করবে ?' ছেলেটি বলল —'আমরা খুব গরিব, লেখাপড়া শিখতে চাই কিন্তু বাবার অবস্থার জন্যে স্কুলে যেতে পারি না।' তখন জমিদার ছেলেটির বাবাকে ডেকে এনে বললেন—'তোমার ছেলে গোপালের লেখাপড়ার ভার আমি নিলাম। ওকে স্কুলে ভর্তি করে দাও, তার জন্যে যা খরচ হবে তা আমার সেরেস্তা থেকে দেওয়া হবে।'

রাখাল ছেলে গোপাল স্কুলে ভর্তি হল, আর মন দিয়ে লেখাপড়া করতে লাগল। তার পড়াশুনা শেষ হলে জমিদারমশায় তাকে তার নিজের সেরেস্তায় গোমস্তার কাজে নিযুক্ত করলেন। চাকরি পেয়ে ছেলেটি খুব খুশি হল আর সেরেস্তার কাজে খুব সুনাম করল।

———o———
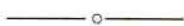
জনৈক মজদুর বালকের সততা

কোনো এক ধনী লোকের বাড়িতে ঝুল-ময়লা সাফ করার জন্যে এক অল্পবয়সি শ্রমিককে ডেকে আনা হয়েছিল। ছেলেটি যে ঘরের ঝুল ঝাড়ছিল, সেই ঘরটি সুন্দর সুন্দর দামি আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো ছিল। জিনিসগুলি এতই সুন্দর যে দেখে ছেলেটির খুব আনন্দ হচ্ছিল। সে যখন ওই ঘরে কাজ করছিল তখন সেখানে বাড়ির লোকজন কেউ ছিল না, তাই সে প্রত্যেকটি জিনিস একবার করে হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখছিল। তার নজরে পড়ল একটি সুন্দর দামি পাথর বসানো ঘড়ির উপর। ঘড়িটি এবং সেটির চাকচিক্য দেখে তার সেটি নেবার লোভ হল। সে মনে মনে ভাবছিল

'যদি এরকম একটি ঘড়ি আমি পেতাম তো বেশ হত। তার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাপল এবং সে ঘড়িটি চুরি করবার মতলব করল। কিন্তু পরক্ষণেই ভয়ে চিৎকার করে উঠল—'হায়রে ! আমার মনে এ কী পাপ বুদ্ধি ভর করল। ঘড়িটা চুরি করলে যদি ধরা পড়ে যাই তাহলে আমার কী দুর্দশা হবে ? আমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে। আমার বিচার হবে, আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। জেলখানায় গিয়ে পাথর ভাঙতে হবে আর ঘানি টানতে হবে। লোকে আমাকে চোর বলে অবিশ্বাস করবে, আর কাজ করবার জন্যে কেউ

ডাকবে না। যদি মানুষের হাতে ধরা নাও পড়ি তাহলেই বা কী, ভগবানের হাত থেকে কোনো দিন ছাড় পাব না। মা বারবার বলতেন যে, আমরা ঈশ্বরকে দেখতে না পেলেও ঈশ্বর আমাদের সব সময় দেখছেন। তাঁকে লুকিয়ে কিছুই করা যায় না। তিনি ঘন অন্ধকারেও দেখতে পান। এমনকী মনের কথাও জানতে পারেন।' এই সব চিন্তাভাবনার ফলে ছেলেটির মনোভাব পাল্টে গেল, তার শরীর ঘেমে উঠল, আর সে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

ঘড়িটি যথাস্থানে রেখে সে বলতে লাগল—'লোভ বড় সাংঘাতিক জিনিস। মানুষ লোভে পড়েই চুরি করে। সত্যিই তো বড়লোকের ঘড়ি দিয়ে আমি কী করব ? লোভ আমার মনকে বিপথে টানছিল, কিন্তু ভগবান আমাকে বাঁচিয়েছেন, ঠিক সময়ে তিনি মায়ের কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর কোনোদিন লোভ করব না। চুরি করে ধনী হওয়ার চেয়ে ধর্মের পথে থেকে গরিব থাকা অনেক ভালো। যত বড় ধনী হোক না কেন, চোর ব্যক্তি কোনোদিন সুখে ঘুমুতে পারে না। চুরির চিন্তা মাথায় আসামাত্রই আমার মন কত না অশান্ত হয়ে উঠেছে। যদি আমি চুরি করে ফেলতাম, কে জানে আরো কত কষ্ট পেতাম।' এই সব কথা উচ্চারণ করতে করতে ছেলেটি শান্ত মনে আবার কাজে লেগে গেল।

বাড়ির গিন্নি পাশের ঘর থেকে সব দেখছিলেন, আর শুনছিলেন। তিনি বেরিয়ে এসে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এই ছেলে ! তুই ঘড়িটা রেখে দিলি কেন ? লুকিয়ে নিতে পারতিস তো ?' এই কথা শুনে ছেলেটির মুখ শুকিয়ে গেল। লজ্জায় সে মাথা নিচু করে বসে পড়ল, আর কাঁপতে লাগল। তার মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোল না। শুধু চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল গড়াতে লাগল।

ছেলেটির এই রকম করুণ অবস্থা দেখে গিন্নির খুব মায়া হল। তিনি খুব মিষ্টি করে তাকে বললেন—'বাছা ! ভয় কী, আমি তোর সব কথাই শুনেছি। তুই যে গরিব হওয়া সত্ত্বেও এত সৎ, বিশ্বাসী আর ধর্মভীরু তা জেনে আমি

খুব খুশি। ধন্য তোর মা, যে তোকে এই রকম সৎশিক্ষা দিয়েছে। তোর উপর ভগবানের অশেষ কৃপা যে তিনি তোকে লোভ জয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন। বাবা ! হুঁশিয়ার থাকিস মনকে কোনো দিন লোভে পড়তে দিস না। আমি তোর থাকা, খাওয়া আর লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তুই কাল থেকেই স্কুলে যা, আর মন দিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করে দে। ভগবান তোর মঙ্গল করবেন।' এই বলে গিন্নি-মা ছেলেটিকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরলেন, আর কাপড়ের আঁচল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন —'তোর বিশ্বাসের পুরস্কার তো এখনি কিছু পাওয়া দরকার, না ?' এই বলে কয়েকটি টাকা তার হাতে গুঁজে দিলেন।

এই রকম মমতাভরা কথা শুনে ছেলেটির মন আনন্দে এবং কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। পরের দিন থেকেই সে স্কুলে যেতে আরম্ভ করল। নিজের পরিশ্রমে তথা সত্যের উপর ভরসা করে ভবিষ্যৎ জীবনে সে খুব বিদ্বান আর নামকরা লোক হয়েছিল।
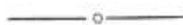
একটি ছোট্ট ছেলের সততা

দুটি বাচ্চা ছেলে একদিন হাত ধরাধরি করে রাস্তায় যাচ্ছিল। যেতে যেতে তারা দেখল রাস্তার ধারে একটি ফুলের বাগানে নানা রঙের ফুল ফুটে রয়েছে। গোলাপ ফুলের গন্ধে চারিদিক ভরে গেছে। এদের মধ্যে একটি ছেলে অপর ছেলেটির হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বাগানের ধারে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে ফুলগুলির দিকে চেয়ে রইল। অন্য ছেলেটি বলল—'কী সুন্দর ফুল দেখ ! কয়েকটা যদি পেতাম তাহলে বোনটাকে নিয়ে গিয়ে দিতাম। ও ফুল খুব ভালোবাসে। কয়েকটা ফুল পেলে ও খুশি হত।' দ্বিতীয় ছেলেটি তাই শুনে বললে—'হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে নে। তোর হাত যাবে না, দাঁড়া আমি ছিঁড়ে দিচ্ছি। তোর হাতের থেকে আমার হাত লম্বা।' এই কথা বলে সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি তার হাত বাড়িয়ে গোলাপের একটি থোকা ছিঁড়ে নিল। প্রথম

ছেলেটি দেখে বলল—'কেন ছিঁড়লি, না বলে কারো জিনিস ছুঁতে আছে ?' ফুল ছেঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে বাগানের মালি তা দেখতে পেয়ে দৌড়ে এসে ছেলেটিকে ধরে ফেলল আর গালে দু'চড় মারল। তারপর টানতে টানতে মালিকের কাছে নিয়ে চলল। প্রথম ছেলেটি বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে 'বাড়িতে কে আছেন', বলে ডাকতে লাগল। ভিতর থেকে এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এসে কপাট খুলে দিলেন। ছেলেটি বলল—'ঠাকুমা ! আমার অসুস্থ বোনের জন্যে গোটাকতক ফুল দেবেন ?' খুশি হয়ে বৃদ্ধা বললেন—'বাবা !

তোমাদের কথা আমি সব শুনেছি। তুমি খুব ভালো ছেলে, চলো তোমাকে ফুল তুলে দিচ্ছি।' তারপর বৃদ্ধা বাগানে ঢুকে এক থোকা গোলাপ ফুল তুলে নিয়ে ছেলেটির হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমাদের বাড়ি কোথায় ? বাড়িতে তোমার অসুস্থ বোন ছাড়া আর কে আছে ?' ছেলেটি উত্তর দিল—'আমাদের বাড়ি ওই বাজার যাবার পথে যেখানে একটা বড় শিমুলগাছ আছে ওইখানে, দু-তিনটে বাড়ির পরই। বাড়িতে আমার মা আছে, দত্তদের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে। আর একটি খোঁড়া বোন আছে, হাঁটতে পারে না, ঘরেই থাকে।' বৃদ্ধা বললেন—'তোমার নাম কী ? যদি যাই তোমাদের বাড়ি খুজে বার করতে হবে তো ?' ছেলেটি বলল—'আমার নাম মান্তু। কিন্তু আমাকে তো কেউ চিনবে না ; আমার মায়ের নাম অলকা, তাকে সবাই চেনে।' তারপর ছেলেটি ফুল নিয়ে চলে গেল। একদিন বিকালে সেই বৃদ্ধা হাতে একগাদা ফুল নিয়ে তাদের বাড়িতে গেলেন এবং তার বোনের হাতে ফুলগুলি দিয়ে বললেন—'যখনি ফুলের দরকার হবে তোমার দাদাকে বলে আনিয়ে নেবে, কেমন।' বৃদ্ধা মান্তুর মাকে বলে গেলেন—'তোমার ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করে দাও। ওর পড়ার খরচ আমি দেব।'

ছেলেটি পরের দিন থেকে স্কুলে যেতে লাগল। ক্রমে কিছু লেখাপড়া শিখে ওই বৃদ্ধার বাড়িতেই চাকরের কাজ করতে লাগল। সততার কী সুন্দর নজির।

একটি গরিব ছেলের সততা

একটি নয়-দশ বছরের ছেলে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তায় সে একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখল। আশপাশে চারদিকে দেখল কেউ কোথাও নেই। তখন অগত্যা সে ব্যাগটি কুড়িয়ে নিল আর সেটি খুলে দেখল তার মধ্যে একশো কুড়ি টাকা রয়েছে। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ চিন্তা করে নিল যে, এই ব্যাগটি যার তাকে এটি ফেরত দেওয়া দরকার। কিন্তু আশপাশে কাউকেই দেখতে না পেয়ে ভাবতে লাগল কীভাবে ব্যাগটি ফেরত দেওয়া যায় ! কিন্তু

কোনো উপায় মনে এল না। তখন সে বাড়ি এসে তার মাকে সব কথা খুলে বলল। ছেলেটি ছিল খুব গরিব। ছেলেটির মা, আর তার অসুস্থ একটি

বোন—এই নিয়ে তাদের সংসার। বোনের চিকিৎসার জন্যে টাকা জোগাড় করতেই সে তার কাকার কাছে যাচ্ছিল। ফিরে এসে ব্যাগটি মায়ের হাতে দিয়ে বলল—'মা! কী করে ব্যাগটি তার মালিককে ফেরত দেওয়া যায়। দেখ মা যে বেচারা এই টাকাসমেত ব্যাগটি হারিয়েছে সে নিশ্চয় এতক্ষণ খুব হা-হুতাশ করছে। এতগুলি টাকা আমি নিয়ে নিলে মহাপাপ হবে। ভগবান

আমার উপর রুষ্ট হবেন। কিন্তু সে লোককে পাই কোথায় ? মা, তুমি কোনো উপায় বলে দাও না, যাতে তাকে খুজে বার করা যায়।' ছেলেটির মা-ও খুব সৎ মহিলা। তিনি ছেলের কথা শুনে খুব খুশি হলেন, বললেন—'এক কাজ কর। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দে, তাহলে বিজ্ঞাপন দেখে যার টাকা সে এসে নিয়ে যাবে।'

ছেলেটি পরের দিন খবরের কাগজওয়ালাদের কাছে গিয়ে সব খুলে বলল। কাগজওয়ালাও ছেলেটির সততায় খুশি হয়ে তার নামেই বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিল যে, 'রাস্তায় একটি ব্যাগ কুড়িয়ে পাওয়া গেছে, তাতে কিছু টাকা আছে। যার ব্যাগ সে যেন নীচের ঠিকানার নিজে এসে উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে ব্যাগটি ফেরত নিয়ে যায়।' বিজ্ঞপ্তি পড়ে ব্যাগের মালিক সত্ত্বর ওই ঠিকানায় চলে এল, আর এসে দেখল বাড়ি বলতে একটি খড়ের ছাউনি চালাঘর, ঘরের প্রাচীর নেই, উঠানে পাঁচ-ছ বছরের একটি মেয়ে মাদুর পেতে শুয়ে আছে। ভদ্রলোক দেখেই মনে করলেন বোধহয় তিনি ভুল ঠিকানায় এসেছেন। তাই ইতস্তত করছিলেন, চলে যাবেন কিনা। ইত্যবসরে ঘরের ভিতর থেকে একটি ছেলে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল—'আপনি কি কাউকে খুজছেন ?' ভদ্রলোক বলল—'হ্যাঁ, আমি গোপাল বাগকে খুঁজছি, আমার একটি ব্যাগ সে কুড়িয়ে পেয়েছি।' ছেলেটি বলল—'আমিই গোপাল বাগ, আপনার ব্যাগটি কুড়িয়েছি। ওতে কত টাকা ছিল ?' ভদ্রলোক বলল—'একশো কুড়ি টাকা ছিল।' গোপাল বলল—'আপনারই ব্যাগ বটে, দাঁড়ান এনে দিচ্ছি', বলে গোপাল ঘরের ভিতর চলে গেল। পরক্ষণেই ব্যাগটি বার করে এনে ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বলল—'এই নিন আপনার ব্যাগ, আর গুনে দেখুন আপনার টাকা ঠিক আছে কিনা।' ভদ্রলোক টাকা গুনবেন কী, তিনি অবাক হয়ে গেছেন—এত গরিব অবস্থার মধ্যেও এত সততা ! এত গরিব হয়েও অপরের পয়সায় লোভ নেই ! প্রকৃতপক্ষে গরিবই বেশি বিশ্বাসী হয়। পয়সাওয়ালা লোক তো অভাবি না হয়েও পয়সার গন্ধ পেলে বেইমানি করতে ছাড়ে না। ছেলেটিকে

বললেন—'ধন্যবাদ তোমাকে, ভগবানের উপর বিশ্বাস করে নিজের সততায় দৃঢ় রয়েছ। মাটিতে শুয়ে আছে ও তোমার কে ?' গোপাল বলল— 'ও আমার ছোট বোন, অসুখে ভুগছে। ওর চিকিৎসার জন্যেই সেদিন কাকার কাছে টাকা ধার করতে যাচ্ছিলাম।' ভদ্রলোক আর একবার অবাক হলেন। ভাবলেন এত টাকার দরকার তবু সে পরের টাকা আত্মসাৎ করতে পারল না। ভদ্রলোক তার ব্যাগের সব টাকাগুলি গোপালের হাতে দিয়ে বললেন—'এই টাকাটা তুমিই রাখো। তোমার বোনের চিকিৎসা এই টাকা দিয়েই করবে। আর একটা কথা, তুমি যদি কাজ করতে চাও তবে একটা দোকানে তোমাকে কাজে লাগিয়ে দিতে পারি। মাসে মাসে তিরিশ টাকা করে পাবে।' গোপাল বলল—'তাহলে তো খুব ভালো হয়। আমাদের দিন-চলা খুব ভার হয়েছে।'

গোপাল দোকানে কাজ পেল আর তাদের অভাব কিছুটা মিটল। এই গোপালই সততার উপর বিশ্বাস রেখে পরে একজন বড় ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছিল।

জনৈক হোটেলওয়ালার সততা

ব্যবসার উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি কোনো এক জায়গায় যাচ্ছিল। মাঝপথে সন্ধে হয়ে আসে। সে তখন নিকটে একটি হোটেলের খোঁজ করে সেখানে গিয়ে ওঠে। হোটেলের মালিককে সে বলে—'আজ রাতটা আমি হোটেলেই থাকতে চাই, ভোরে উঠেই চলে যাব। আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না তো ?' হোটেলওয়ালা বলে— 'না, না, অসুবিধা কিসের, আপনি থাকুন, আমার ছেলে সব ব্যবস্থা করে দেবে, আর ভোরবেলাতে আপনাকে জাগিয়ে দেবে।' পরের দিন সকাল না হতেই লোকটি হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে তার খেয়াল হয় টাকার থলিটি নেই। থলিতে প্রায় তিন-চারশো টাকা ছিল। কিন্তু থলিটি যে কোথায় পড়েছে সে কথা একবারও মনে

করতে পারল না। সে তখন থলির আশা একরকম ছেড়েই দিল।

এদিকে হোটেল থেকে লোকটি বেরিয়ে যাবার পরেই হোটেল মালিকের ছেলের নজরে পড়ল হোটেলের চাতালে কী যেন একটা থলির মতো পড়ে রয়েছে। সে সেই জায়গাটায় গিয়ে দেখল সত্যি সত্যি একটা থলি পড়ে রয়েছে। সে থলিটিতে হাত না দিয়ে সোজা তার বাবার কাছে গিয়ে সব কথা বলল। তার বাবা শুনে বলল—'তুই ওতে হাত দিতে যাস না, বরং কিছু ডালপালা নিয়ে এসে ওটা চাপা দিয়ে দে।' ছেলেটি সেইমতো

কতকগুলি গাছের ডালপালা ভেঙে এনে থলিটি চাপা দিয়ে দিল।

বেশ কিছুদন পর সেই লোকটি আবার ওই পথে যাবার সময় সেই হোটেলটিতেই এসে উঠল, আর সেই রাত্রি সেখানে থাকার ব্যবস্থা করল। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর মালিকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার থলিটির কথা উঠল। থলির কথা শেষ না হতেই সেই হোটেলওয়ালা বলল —'আপনার থলিটি যেখানে পড়েছিল, সেখানেই পড়ে আছে। সেটিতে আমার ছেলে হাতও দেয়নি, শুধু ডালপালা দিয়ে চাপা দিয়ে রেখেছে। দাঁড়ান ও এখনি জায়গাটা দেখিয়ে দেবে।'

লোকটি ছেলেটির সঙ্গে সেই জায়গায় গিয়ে পাতাগুলি সরিয়ে দ্যাখে সত্যিই এটি তারই থলি বটে। তারপর থলিটি নিয়ে সে হোটেলে ফিরে এসে সকলের কাছে ছেলেটির খুব প্রশংসা করতে লাগল। বলল— 'আপনাদের মতো বিশ্বাসী লোক আমি খুব কমই দেখেছি। যে ছেলে পরের দ্রব্যে হাত পর্যন্ত দিতে চায় না তার মতো সৎ আর বিশ্বাসী দুটি হয় না। আমি খুব খুশি হয়েছি। কী বলে যে আপনাদের ধন্যবাদ দেব তা ভেবে পাচ্ছি না।'

যারা পরের জিনিসে লোভ করে না তারাই তো সকলের কাছে বিশ্বাসী বলে গণ্য হয়।

এক সবজি বিক্রেতা বালকের সততা

তরকারির বাজারে একটি ছেলে দৈনিক শাকসবজির ডালা সাজিয়ে বসত আর তার পাশেই আর একটি ছেলেও শাকসবজি নিয়ে বসত। একদিন দুপুরে একটি খদ্দের প্রথম ছেলেটির দোকানে এসে একটি বড় তরমুজ হাতে নিয়ে বলল— 'তরমুজটা কেমন রে, ভালো হবে তো ?' ছেলেটি জবাব দিল—'না বাবু ! তরমুজটা খুব ভালো হবে না। দেখতে ওটা খুব সুন্দর কিন্তু ভিতরটা সাদা, কাজেই খেতে পানসে হবে।' এই কথা শুনে লোকটি পাশের ছেলেটির দোকানে গেল, আর যাবার সময় বলে গেল—'তুই দোকানদারি

করতে পারবি না। এত সৎ হলে দোকানদারি করা মুস্কিল।' ছেলেটি উত্তর দিল—'আমি সত্যি কথা বলে মাল বেচব, যার ইচ্ছা সে নেবে, যার ইচ্ছা হবে না সে নেবে না। তা বলে মিথ্যা বলতে হবে নাকি ?'

সেই ভদ্রলোক দ্বিতীয় ছেলেটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'তোমার কাঁকুড়গুলি টাটকা ?' ছেলেটি চটপট বলল—'হ্যাঁ বাবু ! টাটকা। এই সবে মাঠ থেকে তুলে আনলাম। এখনি এক ভদ্রলোক দু-কেজি নিয়ে গেল।' ভদ্রলোক বলল—'দাও তবে, আমাকেও দু-কেজি দাও।' ভদ্রলোক কাঁকুড়

নিয়ে বাড়ি চলে গেল। কাকুড়ওয়ালা ছেলেটি টিটকিরি মেরে প্রথম ছেলেটিকে বলল—'দেখলি, মাল কী করে বেচতে হয় ? ওরে ! মাল বেচার কায়দা জানা চাই। দেখলি তো, আমার কাঁকুড়গুলো তিনদিনের বাসি তবু কেমন বিক্রি করে দিলাম।' তরমুজওয়ালা ছেলেটি বলল— 'আমি কোনো দিন মিথ্যা বলতে পারব না, তাতে তরমুজগুলো যদি ফেলে দিতে হয় সেও ভালো। ভগবান যদি থাকেন তো, আমার মাল ঠিকই বিক্রি হবে।'

ভদ্রলোক কাঁকুড় নিয়ে বাড়ি গিয়ে একটি কাঁকুড় কেটে খেয়ে দেখল টক। তারপর একে একে সবগুলি কেটে দেখল, সবই একইরকম। প্রতিটি কাঁকুড় ভিতরে পাকা আর টক গন্ধ। ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে বলল—'দেখেছ ! কাঁকুড়গুলো অন্তত এক সপ্তাহ আগেকার, আর ছেলেটা বলল টাটকা। এতটুকু ছেলে খদ্দেরকে ঠকাতে ওস্তাদ। আর কোনোদিন ওর দোকানে যাব না।' এরপরের দিন লোকটি সেই তরমুজওয়ালা প্রথম ছেলেটির কাছ থেকে সব সবজি কিনল। ওই ছেলেটির কাছে আর কোনো দিন যায় না।

তরমুজওয়ালা ওই ছেলেটির সততা শহরের চারদিকে ছড়াতে লাগল। আস্তে আস্তে তার দোকানে বিক্রি বাড়তে লাগল। তার দোকানও বাজারের মধ্যে বেশ বড় হয়ে উঠল। আর পাশের ছেলেটির দোকান আস্তে আস্তে এমন হল যে, তাকে একদিন ব্যবসা তুলে দিতে হল।'

ব্যবসায় সততা না থাকলে উন্নতি করা যায় না।

———o———

জনৈক স্কাউট বালকের সততা

কোনো এক স্কুলে বাৎসরিক পরীক্ষা চলছিল। সেদিন ছিল গণিতের পরীক্ষা। প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে ছাত্ররা মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল কারণ গণিতের প্রশ্নপত্র ছিল অত্যন্ত কঠিন। একটি অঙ্কও কোনো ছাত্রের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। তাদের প্রত্যেকের মুখে আতঙ্কের ছায়া দেখা দিল। স্কুলের বাইরে যে সমস্ত ছাত্রদের আত্মীয়স্বজন দাঁড়িয়েছিলেন তারাও খবরটা

পেয়ে এই নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সেই সময় কোনো একটি ছাত্র গোপনে তার প্রশ্নপত্রটি তার দাদার এক বন্ধুর কাছে পাচার করে দিল। দাদার বন্ধুটি সব অঙ্কগুলি একটি খাতায় কষে গোপনে ক্লাসে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। ওই ঘরে যতগুলি ছাত্র পরীক্ষা দিচ্ছিল সবাই ওই খাতা দেখে অঙ্কগুলি নিজের নিজের খাতায় টুকে নিল। কিন্তু একটি ছেলে কেমন ইতস্তত করছিল। তার নাম অরূপ। সে ছিল একটি স্কাউট বয়। সে নিয়মিত স্কাউটের ট্রেনিং নিত। পরীক্ষার খাতায় নকল করা তার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল, তাই খাতা

দেখে লিখে নিতে খুব দ্বিধা হচ্ছিল। কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করার লোভও সামলাতে পারছিল না। অবশেষে সব সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়ে সেও অঙ্কগুলি নিজের খাতায় টুকে নিল, আর খাতা জমা দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

স্কাউট বয়দের নিয়মকানুন খুব কড়া। প্রত্যেককে রোজকার রোজ কাজের বিবরণ রাত্রে শোবার আগে খাতায় লিখে রাখতে আর নিজের দৈনন্দিন চালচলন ঠিক রাখার জন্যে স্কাউটের উপদেশসংবলিত নিয়মাবলীতে অবশ্যই চোখ বুলিয়ে নিতে হয়।

রাত্রে যখন শোবার আগে অরূপ সেই স্কাউটের নিয়মাবলি পড়ছিল, তখন প্রথম নিয়মটি পড়েই সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

প্রথম উপদেশটিই ছিল 'সর্বদা সত্য পালন করবে।' কিন্তু আজকে সে অসৎ পথ অবলম্বন করে এসেছে। পরীক্ষার খাতায় অপরের খাতা থেকে নকল করে এসেছে। এই কৃতকর্মের জন্যে সে খুব অনুতপ্ত হল। সে তখনি উঠে জামাকাপড় পরে সোজা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বাড়ি গিয়ে তার দরজায় কড়া নাড়তে লাগল। প্রধান শিক্ষক দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখেন অরূপ দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'কী ব্যাপার ! তুমি এত রাত্রে ?' অরূপ তখন পরীক্ষা হলে যা যা ঘটেছে সব খুলে বলে ফেলল। সে আরো বলল—'স্যার ! আমি খুব অন্যায় করেছি, আপনি আমাকে যা শাস্তি দেবেন আমি মাথা পেতে নেব।' প্রধান শিক্ষক বললেন—'অরূপ ! নিজে থেকেই তোমার অন্যায়ের উচিত শাস্তি হয়ে গেছে। নতুন করে তোমাকে আর কী শাস্তি দেব ? আমি আর একবার তোমার অঙ্কের পরীক্ষা নেব।'

অরূপের পুনরায় অঙ্কের পরীক্ষা নেওয়া হল, আর এবার সে ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করে গেল। অন্যান্য ছেলেদের নকল করার অপরাধে শাস্তি হয়ে গেল।

———o———

॥ শ্রীহরি ॥

গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ প্রকাশিত বাংলা বই-এর সূচীপত্র

কোড নং

(১) 1118 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (তত্ত্ব-বিবেচনী) বৃহৎ আকারে
লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা
গীতা-বিষয়ক ২৫১৫টি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সমগ্র গীতা-গ্রন্থের বিষদ্ ব্যাখ্যা

(২) 763 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (সাধক-সঞ্জীবনী)
লেখক—স্বামী রামসুখদাস
প্রতিটি শ্লোকের পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ ব্যাখ্যাসহ সুবৃহৎ টীকা। সাধকগণের আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশের এক অনুপম গ্রন্থ।

(৩) 1577 শ্রীমদ্ভাগবত (প্রথম খণ্ড)

(৪) 1744 শ্রীমদ্ভাগবত (দ্বিতীয় খণ্ড)

(৫) 1574 সংক্ষিপ্ত মহাভারত (প্রথম খণ্ড)

(৬) 1660 সংক্ষিপ্ত মহাভারত (দ্বিতীয় খণ্ড)

(৭) 1662 শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

(৮) 556 গীতা-দর্পণ
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উল্লিখিত ১০৮টি বিষয়ের সামগ্রিক দর্শন-ভিত্তিক অভিনব আলোচনা। গীতার গভীরে প্রবেশে ইচ্ছুক জিজ্ঞাসুদের পক্ষে বইটি খুবই উপযোগী।

(৯) 13 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
অন্বয়, পদচ্ছেদসহ প্রতিটি শ্লোকের ভাবার্থ সহ সরল অনুবাদ।

(১০) 496 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
মূল শ্লোকসহ সরল অনুবাদ

(১১) 1736 গীতা প্রবোধনি

(১২) 1393 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (বোর্ড বাইন্ডিং)

কোড নং

(১৩) 395 গীতা-মাধুর্য

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

প্রতিটি শ্লোকের পৃষ্ঠভূমিতে প্রশ্নোত্তররূপে উপস্থাপিত এই বইটি নবীন এবং প্রবীণ সকলকেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম।

(১৪) 1444 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অতি ক্ষুদ্র আকারে সমগ্র মূল শ্লোকের অভিনব সংস্করণ।

(১৫) 1455 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (লঘু আকারে)

(১৬) 954 শ্রীরামচরিতমানস (রামায়ণ)

তুলসীদাসের অমরকীর্তি, মূল দোঁহা চৌপাই-এর সরল অনুবাদ।

(১৭) 275 কল্যাণ প্রাপ্তির উপায়

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধন পথের গূঢ় তত্ত্বের সহজ আলোচনা।

(১৮) 1456 ভগবৎপ্রাপ্তির পথ ও পাথেয়

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

ঈশ্বরলাভের সাধনায় রত সাধকদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তক।

(১৯) 1469 সর্বসাধনার সারকথা

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

(২০) 1119 ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ?

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বইটি খুবই উপযোগী।

(২১) 1305 প্রশ্নোত্তর মণিমালা

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক ৫০০টি প্রশ্নের মূল্যবান সমাধান সূত্র।

(২২) 1102 অমৃত-বিন্দু

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

সূত্ররূপে উপস্থাপিত এক সহস্র অমৃত বাণীর অভূতপূর্ব সংকলন।

(২৩) 1115 তত্ত্বজ্ঞান কি করে হবে ?

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

তত্ত্বজ্ঞান লাভের একটি সরল মার্গ-দর্শিকা।

কোড নং

(২৪) 1358 **কর্ম রহস্য**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

ভগবান গীতায় বলেছেন **'গহনা কর্মণো গতিঃ'** — সেই কর্ম-তত্ত্বের অনুপম বর্ণনা।

(২৫) 1122 **মুক্তি কি গুরু ছাড়া হবে না ?**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

গুরু বিষয়ক বিভিন্ন শঙ্কা-সমাধানের উদ্দেশ্যে লিখিত এই পুস্তিকাটি বর্তমানে প্রতিটি লোকেরই একবার অবশ্যই পড়া কর্তব্য।

(২৬) 276 **পরমার্থ পত্রাবলী**

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধকগণের উদ্দেশ্যে লিখিত ৫১টি আধ্যাত্মিক পত্রের দুর্লভ সংকলন।

(২৭) 816 **কল্যাণকারী প্রবচন**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

সাধকগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ১৯টি অমূল্য প্রবচনের সংস্করণ।

(২৮) 1460 **বিবেক চূড়ামণি** (মূল সহ সরল টীকা)

শ্রীমৎ শংকরাচার্য বিরচিত জ্ঞানমার্গের সুপরিচিত গ্রন্থ।

(২৯) 1454 **স্তোত্ররত্নাবলী**

প্রাচীন বিভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্রের মূলসহ সরল অনুবাদ।

(৩০) 1603 **উপনিষদ্**

(৩১) 1604 **পাতঞ্জলযোগ**

(৩২) 903 **সহজ সাধনা**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

সাধন পথের সহজতম দিগ্‌-দর্শন।

(৩৩) 312 **আদর্শ নারী সুশীলা**

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে বর্ণিত ২৬টি দৈবীগুণকে কেন্দ্র করে একটি মহিলার জীবন-চরিত্র।

(৩৪) 1415 **অমৃত-বাণী**

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

(৩৫) 1541 **সাধনার দুটি প্রধান সূত্র**

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

কোড নং

(৩৬) 1478 **মানব কল্যাণের শাশ্বত পথ**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

বিভিন্ন সাধন-মার্গের নির্বাচিত ২০টি প্রবচনের এক অমূল্য সংগ্রহ।

(৩৭) 1651 **হে মহাজীবন ! হে মহামরণ !!**

স্বামী রামসুখদাস মহারাজের স্বপ্রসঙ্গের নির্দেশাবলী।

(৩৮) 1306 **কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি**

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

কর্ম-তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা।

(৩৯) 955 **তাত্ত্বিক-প্রবচন**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

গভীর তত্ত্বের সরলতম ব্যাখ্যা।

(৪০) 428 **আদর্শ গার্হস্থ জীবন**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

বর্তমানের অশান্ত পারিবারিক জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনার সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত পুস্তিকা।

জয়দয়াল গোয়েন্দকা প্রণীত অন্যান্য বাংলা বই—

(৪১) 296 সৎসঙ্গের কয়েকটি সার কথা

(৪২) 1359 পরমাত্মার স্বরূপ এবং প্রাপ্তি

(৪৩) 1140 ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব

স্বামী রামসুখদাস প্রণীত অন্যান্য বাংলা বই—

(৪৪) 1303 সাধকদের প্রতি

(৪৫) 1579 সাধনার মনোভূমি

(৪৬) 1580 অধ্যাত্ম সাধনায় কর্মহীনতা নয়

(৪৭) 1581 গীতার সারাৎসার

(৪৮) 1452 আদর্শ গল্প সংকলন

(৪৯) 1453 শিক্ষামূলক কাহিনী

(৫০) 1513 মূল্যবান কাহিনী

(৫১) 625 দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম

(৫২) 956 সাধন এবং সাধ্য

অন্যান্য